Indian Science News Association
ESTD.–1935

বিজ্ঞান কথন

কলকাতা/জুলাই ১২, ২০২৩, বুধবার, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

বি V P প্র

অধিকারের অরণ্য

"জনাকীর্ণ কলিকাতা শহরের বুকে বসিয়া বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুখ কি বুঝা যাইবে? এখানে- এই নির্জন বন-প্রদেশ - সকল বিষয়েই ভাবিবার ও অবাক হইবার অবকাশ আছে- এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সে অনুভূতি আনয়ন করে" - আরণ্যক উপন্যাসে বিভূতিভূষণ এর এই বর্ণনা প্রায় সকলেরই জানা।

বিংশ শতাব্দীতে বিভূতিভূষণ যে অরণ্যের বর্ণনা দিয়েছিলেন, একবিংশ শতাব্দীতে তা কতটা পাল্টাবে তা নতুন প্রজন্মের সাহিত্যিকরা বলতে পারবেন। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা অরণ্যের সাম্প্রতিক অবস্থা তুলে ধরতে পারবেন। সমাজে তা নিয়ে চর্চা হবে। কিন্তু অরণ্যবাসী কি অরণ্যের অধিকার ফিরে পাবে - এ লাখ টাকার প্রশ্ন!

আমরা মুখে যতই বলি - "বন্যেরা বনে সুন্দর.....", কিন্তু কাজে করি কতটা ! বিভূতিভূষণ, তারাশংকর, মহাশ্বেতা দেবীর কলমে অরণ্যের প্রশ্ন উঠে এসেছে বারবার। শহুরে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষ অরণ্যকে নিয়ে উপন্যাস পড়েছেন। অরণ্য নিয়ে সিনেমা দেখেছেন, উপভোগ করেছেন। অরণ্যে গেছেন ছুটি কাটাতে, একঘেয়ে ক্লান্ত জীবনে অক্সিজেন নেওয়ার জন্য ; তার বদলে অরণ্যকে দিয়ে এসেছেন অফুরন্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড, অগণিত প্লাস্টিক আর শহুরে আবর্জনার স্তূপ।

অরণ্য মানুষকে দিয়েছে সবুজের স্নিগ্ধতা, আর মানুষ তার বদলে অরণ্যকে উপহার দিয়েছে গ্রিন হাউস গ্যাস। অসীম লোভের বশবর্তী হয়ে গাছ কেটে একের পর এক বন ধ্বংস করেছে। নিঃস্ব করেছে অরণ্যবাসী পশুপাখির আশ্রয় স্থল: যদিও এই অধিকার মানুষকে কেউ দেয়নি; তবুও বারে বারে মানুষ অরণ্যের ওপর অধিকার ফলিয়েছে। কখনও স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে, কখনও ন্যায় নীতির মোড়কে নিজেরা কিছু আইন তৈরি করেছে।

অরণ্য নিয়ে ভারতে বহু আইন রচিত হয়েছে। গত প্রায় এক শতাব্দী ধরে একগুচ্ছ অরণ্য আইনের আওতায় রয়েছে এদেশের বনাঞ্চল। মোটামুটি ১৮৭৬ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে এই সমস্ত আইন প্রণীত হয়েছিল। ১৯২৭ সালের আইনটিকেই এদেশের অরণ্য সম্পর্কিত মুখ্য আইন বলে গণ্য করা হয়। অরণ্য সংরক্ষণের সঙ্গে এই আইনের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য ছিল বনের কাঠের দিকে। এই স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অরণ্যের ওপর সরকারের মালিকানা প্রতিষ্ঠার দরকার ছিল। সেইসঙ্গে দেশে বন সংরক্ষণ ও বনের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমষ্টিগত উদ্যোগের যে চিরাচরিত ধারা ছিল তাকে দমিয়ে রাখা ও ব্রিটিশ সরকারের কাছে জরুরি হয়ে পড়ে।

তাই নিজেদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই তারা অরণ্য আইন প্রণয়ন করেছিল। এই সমস্ত আইন অনুসারে যে কোনও অঞ্চলকে 'সংরক্ষিত অরণ্য' বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারত সরকার। অরণ্যভূমি, বনজ সম্পদ বা চারণভূমির ওপর অধিকারের দাবি উঠলে তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব থাকত ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের ওপর।

বর্তমান যুগেও অরণ্য নিয়ে অনেক আইন রয়েছে। ২০২২ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক বন সুরক্ষা আইন ১৯৮০ এর নতুন বিধি বা নিয়মাবলী প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে যে জঙ্গলের জমিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বা খনন কাজে বেসরকারি সংস্থাকে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি অনুমতি দেবে।

এর জন্য আদিবাসীদের অনুমতি নেওয়ার আর প্রয়োজন নেই। সরকার অনুমতি দেবে, বনউপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে। যেখানে সরকারি আমলাদেরই প্রাধান্য, বনভূমিকে অন্য কাজে ব্যবহারের বিষয়ে আদি বাসীদের স্বাধীনভাবে অবহিত প্রাক সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়া সে অন্য কাজে তাদের অধিকার খর্ব হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করার নিয়মটাই তুলে দেওয়া হয়েছে ।

বন অধিকার আইন ২০০৬, আর বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের ২০০৯ সালের নির্দেশিকা অনুযায়ী কোনো পরিবারকে জঙ্গল থেকে উৎখাত করতে গেলে, জঙ্গলের জমির চরিত্র বদল করতে হলে, তা সে রাষ্ট্রই হোক বা বেসরকারি সংস্থাই হোক গ্রাম সভার সম্মতি নেওয়ার সম্মতি দেওয়া বাধ্যতামূলক। জমি থেকে উৎখাত করতে গেলে আগে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বন সুরক্ষা আইনের নয়া বিধি - এই রক্ষা কবচটাই তুলে দিল বনভূমির চরিত্র বদলের ক্ষেত্রে।

জঙ্গলের ওপর আদিবাসীদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার দায়ে রাজ্য গুলির ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে কেন্দ্র। উচ্ছেদের অনুমতি দেবে কেন্দ্র আর রাজ্যগুলিকে দেখতে হবে জঙ্গল কাটার আগে আদিবাসীদের সম্মতি নেওয়া হচ্ছে কিনা।

সংসদে যখন এই বিল পাস হয় তখন বার বার উঠে এসেছে উন্নয়নের কথা। বিলের বিরোধিতা যারা করেছিলেন তারা অরণ্যবাসীর জনজাতির সুরক্ষার কথা তুলে ধরেছিলেন। পরিবেশবিদরা অরণ্যের পশু-পাখিদের জন্য বার বার আওয়াজ তুলেছেন। এত আওয়াজের মধ্যে কোথাও যেন নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে সবুজ বনানীর কলরব ; নিষ্প্রভ হয়ে গেছে সবুজের ভাবনা।

অরণ্যকে কে কিভাবে অধিকার করবে তার পরিকল্পনা চলছে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু অরণ্যের কোনো অধিকার নেই, তার নিজের কথা বলার। তার ভাষা কি কেউ বোঝেনা; নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করে নিজেদের অধিকার চলে যাওয়ার ভয়ে!

boseprasanta@hotmail.com
arnab_jour@yahoo.co.in

কোয়ান্টাম - বেল

পথিক গুহ

জন স্টুয়ার্ট বেলের কথা মনে পড়ছে। উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি। নোবেল প্রাইজ পাননি। বেঁচে থাকলে পেতেন। মরণোত্তর নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় না। যদি থাকত সেই ব্যবস্থা, তাহলে তিনি অবশ্যই তা পেতেন।

গত বছর ফিজিক্সে যাঁরা নোবেল প্রাইজ পেলেন, সেই তিন বিজ্ঞানী-আমেরিকান জন ক্লাউসার, ফরাসি অ্যালান আস্পেকট এবং অস্ট্রিয়ান অ্যান্টন জাইলিংগার নোবেল পুরস্কার পেলেন বেলের আইডিয়া সত্যি প্রমাণে।

বলা হল, ওঁদের পুরস্কৃত করা হল এই কারণে যে, ওঁরা পরীক্ষায় বেলের অসাম্য প্রমাণ করেছেন। এটা করে ওই তিনজন কোয়ান্টাম ইনফরমেশন টেকনোলজির গোড়াপত্তন করেছেন।

বেলের অসাম্য কী? কোয়ান্টাম ইনফরমেশন টেকনোলজি কী? বেলের অসাম্য বলতে গেলে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। ১৯৩৩ সালে জার্মানি থেকে পালিয়ে গিয়ে আইনস্টাইন আমেরিকায় আশ্রয় নেন। ওখানে প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিতে যোগ দেন। ওখানকার অধ্যাপক আব্রহাম পায়াস আইনস্টাইনের জীবনী ('সাটল ইজ দ্য লর্ড') লিখেছিলেন। পায়াসের সঙ্গে আইনস্টাইনের ভাব হয়ে গিয়েছিল। দু'জনে একসঙ্গে ইনস্টিটিউট থেকে নিজেদের কোয়ার্টার্সে ফিরতেন।

আইনস্টাইন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিরোধী ছিলেন, তা সকলে জানেন। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে কোনো কণার ধর্ম আগে থেকে ঠিক হয় না। যে মুহূর্তে তা শনাক্ত হয়, সে মুহূর্তে তা ঠিক হয়।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স সম্পর্কে আইনস্টাইনের আপত্তি বোঝাতে পায়াস একটা ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন ওই বইতে।

২>>

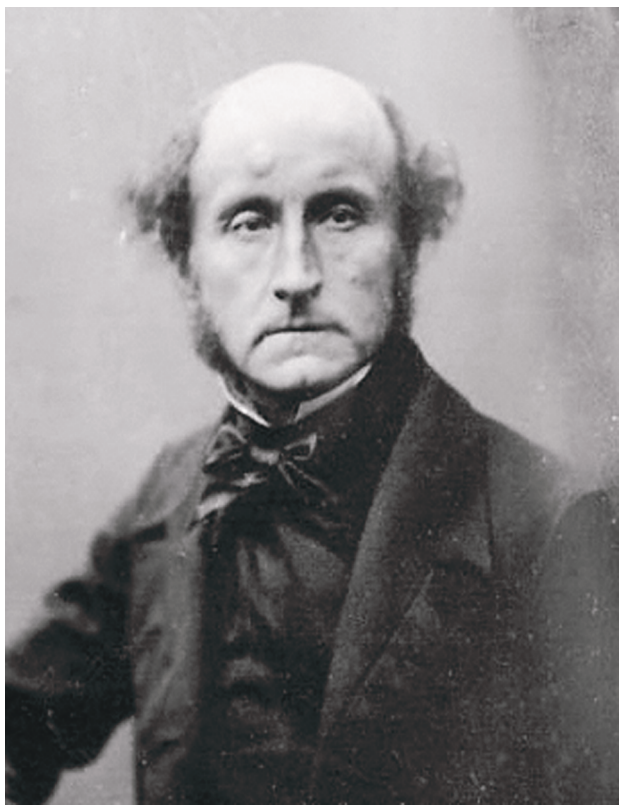

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল: সে আবার কি?

প্রশান্ত কুমার বসু

অনেকবারইতো গিয়েছি। কই কিছুতো বুঝিনি। হ্যাঁ, একবার একটু আবহাওয়া খারাপ ছিল। তবে সেটা বিশেষ কিছু নয়। কথাগুলো বলছিলেন মল্লিক সাহেব।

বরিষ্ঠ মেরিন ইঞ্জিনিয়ার এবং বহু বছরের অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট একজন, যিনি সমুদ্র যাত্রার হাল হকিকত সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

পরেশ নাথ মল্লিকের কাছে আমার প্রথম প্রশ্নটিই ছিল বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে। আটলান্টিক মহাসাগরে একদিকে পুয়ের্তো রিকো, অন্যদিকে কিউবা, এবং অপর পাশে আমেরিকার মায়ামি দিয়ে ঘেরা এই অঞ্চলটা নিয়ে দুনিয়া জুড়ে এত রহস্য কেন? কেনই বা এত গল্পগাথা, এত কল্পকাহিনী? আমি জানিনা কেন, মল্লিক সাহেবের সটান জবাব।

তাছাড়া, ওখানকার দুটি সমুদ্র বন্দর - হ্যামিলটন পোর্ট অফ সেন্ট জর্জ এক, দু বার গিয়েছিলাম, বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েওছি। আর একবার জাহাজে উঠতে লিসবন থেকে কারাকাস উড়ে গিয়েছিলাম। সমুদ্রের আবহাওয়া মাঝে মাঝে একটু খারাপ হয়েছে। এছাড়া তেমন কিছু অনুভব করিনি।

মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ওঁর পেশাটা কিরকম? এই প্রফেশনটা যে কোনো "শোর জব" থেকে অনেকটাই কঠিন। এই প্রফেশনে শারীরিক ভাবে সমর্থ ও মানসিক ভাবে অনেক শক্ত হতে হয়।"আমাদের সব থেকে বড় দায়িত্ব অ্যাডজাস্টিং বিটুইন ওয়েদার একস্ট্রিমিটিজ।" যেকোনো মুহূর্তে নানা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। মাঝ সমুদ্রে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় না। উপরন্তু প্রতিটি জাহাজের সাথে জড়িয়ে থাকে বিরাট অংকের ব্যাবসা, ও কর্মরত প্রতিটি মানুষের জীবন। এ সব নিয়েই এক বন্দর থেকে অন্য বন্দর পাড়ি দেওয়া।

"এটা চিরকালের সত্য, জাহাজে থাকাকালীন ছুটি বলে কিছু নেই যেহেতু জাহাজের সেইলিং প্রোগ্রাম আগে থেকেই ঠিক করা থাকে তাই লোডিং পোর্ট থেকে ডিসচারজ পোর্ট পর্যন্ত অবিরাম কাজ চলতে থাকে। যদিও সকলের জন্য নির্দিষ্ট বিশ্রাম সময় দেওয়া হয় যদিও তবু সকলকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতেই হয়," এক নিঃশ্বাসে বললেন।

তারপরতো আছে জাহাজ চলাকালীন বেশিরভাগ সময় তাদের কনফাইন্ড কন্ডিশন এর কথা। তাপমাত্রা কখনও ৮৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস বা -২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। একদিকে ইকোয়েডর অন্যদিকে রাশিয়া। ভাবুনতো একবার! আমি চোখ বুঁজে অবস্থাটা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। ভয়েই বোধহয়।

যাইহোক, আবার পরিবেশ আর আবহাওয়ার কথায় ফিরে এলাম। উনি জানালেন, বর্তমানে অনেক রেস্ট্রিকশনস ইনক্লুডেড হয়েছে, যেগুলি সম্পর্কে তাঁর খুব বেশি জানা নেই। তবে তার সময়ে (১৯৭০-১৯৮৬) বেশ কিছু বাধ্যবাধকতা ছিল "অন অয়েল স্পিলেজ, ওয়েস্টওয়াটার ডিসচার্জ, গারবেজ ডিস-পোজ্যাল, অর অন এয়ার পলিউশন।"

এইসব রেস্ট্রিকশনস কোষ্টাল এরিয়াতে ভীষন ভাবে মনে চলতে হত।

২ >>

বিজ্ঞান প্রসারে মেয়েদের ভূমিকা ও ভাষার গুরুত্ব

ঈশানী দত্ত রায়

বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাতে মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে যে আপনারা ভাবছেন, এটা অবশ্যই আলাদা তাৎপর্যের। দিন কয়েক আগে সমাজমাধ্যমে জনৈক সুনন্দিনী শুক্লার একটি পোস্ট আমার চোখে পড়ে। আপনারা অনেকেই হয়তো তা দেখে থাকবেন।

সুনন্দিনী মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের একটি ক্লাসের কথা জানিয়েছেন, যেখানে অধ্যাপক ক্লুদিয়া জাসলাভস্কি পড়াতে এসেছিলেন এথনোম্যাথমেটিকস! বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির গাণিতিক সম্পর্ক!

সুনন্দিনী লিখেছেন,'ক্লুদিয়া একটি হাড়ের টুকরোর ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, এটি কী? ছাত্রছাত্রীদের কেউ বলে. দেখে মনে হচ্ছে এটি বোন টুল। অধ্যাপক জানান, ১৯৫০ সালে জঁ দ্য হেইনজেলিন দ্য ব্র্যাকোর্ট এই বোন টুলটি আবিষ্কার করেন, গ্রেট রিপাবলিক অফ কঙ্গোর সেমিলিকি নদীর তীর থেকে। দেখে বুঝতেই পারছ যে হাড়ের টুকরোটিতে কার্ভিং করা হয়েছে। এই যে এই খাঁজকাটা দাগগুলো।"

তিনি জানান, হিসেবটি চান্দ্রমাসের। উনি বলেন, '১৬৮ টা এইরকম খাঁজকাটা দাগ দেখতে পাবে। মোট ছমাসের হিসেব আছে এখানে। সম্ভবত এটিই সেই প্রথম নিদর্শন যখন মানুষ সময়কে চিহ্নের মাধ্যমে বাঁধতে চেয়েছিল, আপন সুবিধার্থে! এখন যেমন আমরা সংখ্যা দিয়ে সময়কে বাঁধতে চাই, আজ অমুক তারিখ, এটা অমুক বছর, ইত্যাদি! অল দিস ইজ আওয়ার মেন্টাল ক্যালকুলেশন! এটা মানুষের সেই বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার আদিমতম নিদর্শন!"

"ওয়াও, সো দিস ইজ আ ম্যান'স

ফার্স্ট এফোর্ট টু ক্রিয়েট আ ক্যালেন্ডার!" - জেকব নামের একটি ছেলে বলে ওঠে! "ম্যান'স এফোর্ট? হাউ ডু ইউ নো দ্যাট, মাই বয়?"...."একটা কথা বলো এই পৃথিবীতে কোন পুরুষের প্রয়োজন পড়ে প্রতি মাসে ২৮ দিনের হিসাব রাখার?"

ছাত্রছাত্রীদের কিছুটা সময় লাগে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে। তারপর একটা চাপা অস্বস্তি দেখা যায় কিছুজনের মধ্যে। "ওহ নো নো! ডোন্ট বি শাই, লেডিস! দিস ইজ আওয়ার বায়োলজিকাল রিয়্যালিটি, আ ফ্যাক্ট! নাথিং টু বি অ্যাশেমড অফ! কোনো নারী আপন ঋতুচক্রের হিসাব রাখার তাগিদেই হাড়ের টুকরোর ওপর দাগ কেটে মাসের হিসার রাখার চেষ্টা করেছিলেন, যাতে তিনি বুঝতে পারেন পরবর্তী মাসে কোন সময় তিনি পুনর্বার রজঃস্বলা হবেন!"

পুরো ক্লাস চুপ হয়ে যায়। এমন ইন্টারপ্রিটেশন করার কথা তারা কেউ ভাবেনি! "সো ক্যান আই অ্যাজিউম, দিস ইজ আ ওম্যান'স ফার্স্ট এফোর্ট টু ক্রিয়েট আ ক্যালেন্ডার?!"

ক্লুদিয়া বলেন, "আসলে আমি একটা কথা বারংবার বলে থাকি। সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, গণিত নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে - নারীদের আরো বেশী করে সব ক্ষেত্রে আসা দরকার।

২ >>

শহরে গাছের শত্রু মানুষ

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

জুলাই মাস মানেই বৃক্ষরোপণ। ভরা বর্ষার মরশুম। আষাঢ়ের শেষ আর শ্রাবণের শুরু। ১ জুলাই থেকেই চারদিকে বৃক্ষরোপণের বিজ্ঞাপন। সরকারি অরণ্য সপ্তাহের উদযাপনও এই সময়ে; ১৪ থেকে ২০ জুলাই। দিকে দিকে গাছ লাগানোর ডাক। পুরনো স্লোগান 'একটি গাছ একটি প্রাণ' এখন 'একটি গাছ অনেক প্রাণ'-এ রূপান্তরিত। স্লোগান থাকলেও প্রশ্নটাও হারিয়ে যায় নি। এতো যে গাছ এই সময় পোঁতা হয় তা বেঁচে থাকে তো? এখানেই প্রশ্ন এবং এই অস্বস্তিকর প্রশ্নকে এড়িয়ে গেলে চলবে না। বেড়া দেওয়া না থাকলে গরু-ছাগল চারাগাছ খেয়ে নেবে

এমন কথা একসময়ে শোনা যেত। কিন্তু আজকের শহরে গাছের শত্রু গরু-ছাগল নয়। তারা শহরে কোথায়? আর থাকলেই বা আছে কত? কাজেই তারা চারাগাছ মুড়িয়ে দিচ্ছে, এমন নয়। শুনলে অবাক লাগলেও সত্যি, শহরে গাছের শত্রু মানুষ। তাদের শত্রুতার নমুনা দিই এবার।

* আবাসনে বাস। ফ্ল্যাটের উঁচুতলার মানুষের বক্তব্য, "গাছ এমন বেড়ে উঠেছে যে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না"। অতএব গাছ কাটো।
* "জানলা জুড়ে গাছের ডাল। দম বন্ধ হয়ে আসে।" কি করে তাঁকে বোঝানো যাবে যে জানলার পাশে থাকা গাছ তাঁকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে।
* "ভাবতে পারেন, সেজেগুজে বিয়েবাড়ি যাচ্ছি এমন সময় গাছের ওপর থেকে পাখি দিল তো জামাটা নোংরা ক'রে। এখন চলো, আবার বাড়ি গিয়ে জামা বদলাও।"
*"ভাবুন একবার, গাছের তলায় গাড়িটা রেখেছিলাম। ওপর থেকে পাতা পড়েছে, পাখি নোংরা করে দিয়েছে। এবার গাড়ি ধোও।"

তাঁকে একথা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে তিনি তো যাতে রোদে গাড়ি গরম না হয়ে যায় সেজন্যই গাড়িটাকে গাছের তলায় রেখেছিলেন। ভাবছেন এসব তো ব্যতিক্রমী সব বক্তব্য। বেশ, তাহলে কথা ছেড়ে কাজের দিকে তাকান। এখন শহরে মাটি খুঁজে পাবেন না। পাড়ার একেনে ফ্ল্যাটের পাশের মাটি সিমেন্ট এবং টালি দিয়ে বাঁধানো। কয়েকটা ফ্ল্যাটের আবাসনেও সব কংক্রিট। এই কংক্রিট পার হয়ে বৃষ্টির জল মাটির তলায় পৌঁছোতে পারে না। গাছের মূল বাধা পায় মাটির ভেতরে ঢোকার পথে। আপনি কি জানেন, এইভাবে সব কিছু সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া যায় না? ভারত সরকারের নগর উন্নয়ন মন্ত্রকের, ২০১৪ সালের "রেগুলেশনস অব আরবান প্রিনিং গাইডলাইন্স"-এ স্পষ্ট বলা হয়েছে যে কংক্রিটকরণ সাধারণভাবে পরিবেশের পক্ষে এবং বিশেষভাবে গাছের পক্ষে ক্ষতিকর। এই কংক্রিটকরণ গাছ পড়ে যাওয়ার জন্যও দায়ী। কারণ মাটি সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে গাছেরা মাটিতে তাদের মূল প্রবেশ করাতে বাধা পায়। শুধু চারাগাছ নয়, বড় গাছেরও শত্রুর অভাব নেই। গাছের চারদিক বাঁধিয়ে দেওয়ার প্রবণতায় গাছ মাটির তলায় তার মূল বিস্তার করতে বাধা পায়। আবার গাছ ছাঁটার নামেও চলে গাছ ধ্বংসের প্রয়াস। এমনভাবে বড় গাছের একদিক কেটে ফেলা হয় যে যখন ঝড় হয় তখন ঝড়ের চাপে একদিকে হেলে থাকা গাছ সহজেই পড়ে যায়। আপনি শুনতে পাবেন, ঝড়ে গাছ পড়ে গেছে। কিন্তু তার পেছনে মানুষের শত্রুতার কথা অকথিত থেকে যায়।

মনে রাখুন, এই যে শহর জুড়ে এত গরম, তার জন্যও সিমেন্ট দিয়ে মাটি বাঁধিয়ে দেওয়া দায়ী। বর্ষা এসে গেছে। শহরে জলা জমার জন্যও দায়ী এই প্রবণতা কারণ সিমেন্ট দিয়ে সব বাঁধিয়ে দেওয়ার জন্যই বৃষ্টির জলকে মাটি শুষে নিতে পারে না। কাজেই, একটু ভাবুন। শুধু 'গাছ লাগান' না বলে এই অপচেষ্টা রুখে দেওয়ার জন্য, সক্রিয় হোন।

ইতিহাস বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
sabya4@klyuniv.ac.in

>>১... মেয়েদের ভূমিকা

না, আমি কোনো নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একথা বলছি না। নারীদের নিজস্ব একটি চিন্তাশক্তি আছে, যাপনের একটি ধরণ আছে। তাই এই সুপ্রাচীন সভ্যতার আনাচে কানাচে তাদের অস্তিত্বের এমন কিছু চিহ্ন ছড়িয়ে থাকতে পারে, যা একমাত্র একজন নারীই দেখে চিনতে পারেন ও ডিকোড করতে পারেন। তাই আমি বলি বিজ্ঞানের স্বার্থেই আমাদের আরো নারীর প্রয়োজন।"

তেমন এই বিজ্ঞানকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আরও বেশি করে মহিলাদের এগিয়ে আসা নিতান্তই দরকার। আমি যখন সংবাদপত্রে প্রথম কাজ করতে আসি, তখন বলা হত, যে খবর এমন ভাবে লিখবে যাতে মা-মাসিরা বুঝতে পারে। তাতে একটি মেয়ে বলেছিল, যে কেন বাবা-জেঠুদের বোঝার দরকার নেই। এই প্রকাশভঙ্গিটা একান্তই পুরুষতান্ত্রিক, কিন্তু যেটা বলতে চাওয়া হয়েছিল, যে ধরুন আমি বাড়ি ফিরে যখন গল্প করি যে মা, বাবা, আজ রাস্তায় এটা দেখলাম বা এটা হল, আমরা যে ভাবে বলি, যে সহজ ভাষায় বলি, সংবাদ পরিবেশনেও সেই সহজ ভঙ্গি থাকা দরকার।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তো কথাটা আরও জরুরি।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞানের খবর লিখতে গিয়ে বা লেখা পড়তে গিয়ে যেটা মনে হয়েছে, আমাদের নিজস্ব বোঝা বা উপলব্ধি যদি ঠিক থাকে, স্বচ্ছ থাকে, তা হলে কিন্তু কাজটা অনেক সহজ হয়। এবং এই চ্যাটজিপিটির যুগেও মানুষ যা চায়,

আমি সংবাদকর্মী হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতা বলতে পারি, মানুষ যা চান, তা হল তথ্য, নতুন তথ্য, সেটা তো বিজ্ঞানের জগতে দিয়ে শেষ করা যাবে না। আর ভাষার বিষয়ে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিশ্বপরিচয় বইয়ের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উদ্দেশ্য করে যা লিখেছিলেন, তার থেকে কয়েকটি লাইন পড়ে শোনাইঃ 'এই বইখানিতে একটি কথা লক্ষ্য করবে-এর নৌকোটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে কিন্তু মাল খুব বেশি কমিয়ে দিয়ে একে হালকা করা কর্তব্য বোধ করিনি। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না। আমার মত এই যে, যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই ব'লে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজ্যশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। যে বিষয়টা শেখবার সামগ্রী, নিছক ভোগ করবার নয় তার উপর দিয়ে অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া এবং চেষ্টা ক'রে বোঝাটাও শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর।

নিজের যে শিক্ষার চেষ্টা বাল্যকালে নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলুম তার থেকে আমার এই অভিজ্ঞতা। এক বয়সে দুধ যখন ভালোবাসতুম না, তখন গুরুজনদের ফাঁকি দেবার জন্যে দুধটাকে প্রায় আগাগোড়া ফেনিয়ে বাটি ভরতি করার চক্রান্ত করেছি। ছেলেদের পড়বার বই যারা লেখেন, দেখি তারা প্রচুর পরিমাণে ফেনার জোগান দিয়ে থাকেন। এইটে ভুলে যান জ্ঞানের যেমন আনন্দ আছে তেমনি তার মূল্যও আছে, ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস হতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারকে ফাঁকি দেওয়া হয়। চিবিয়ে খাওয়াতেই একদিকে দাঁত শক্ত হয় আর একদিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায়, এ বই লেখবার সময়ে সে কথাটা সাধ্যমতো ভুলিনি।

(ইসনার ১৪তম সায়েন্স কমিউনেকটরস' মিট-এ প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণের অংশ- বিশেষ-এর পূর্ণমুদ্রণ)

ঈশানী দত্ত রায়
সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

সায়রী বিশ্বাস

সুদূর জার্মানি থেকে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর পমার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রফেসর শঙ্কুকে তার তৈরি যন্ত্র মানব রোবুকে সঙ্গে নিয়ে জার্মানি পাড়ি দেওয়ার জন্য। তবে সমস্যা একটাই। এখনো বাংলা আর ইংরেজি ছাড়া আর কোন ভাষা বলতে পারে না রোবু। তবে এক মাসে জার্মানটা শিখিয়ে নিলে সরাসরি প্রফেসর পমার এর সাথে কথা বলতে পারবে নিশ্চয়ই। দেড় বছরের পরিশ্রমে রোবুকে তৈরি করেছেন প্রফেসর শঙ্কু। সাধারণ যোগ বিয়োগ গুন ভাগ করতে রোবুর সময় লাগে ১ সেকেন্ডেরও কম। আর যে কোন কঠিন থেকে কঠিনতর অংক কষতে সর্বাধিক সময় লাগে ১০ সেকেন্ড। পঞ্চাশ হাজার ইংরেজি আর বাংলা প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে পারে। তবে ব্রেনের জায়গায় একগাদা ইলেকট্রিক তার, ব্যাটারি, ভালভ ইত্যাদি থাকায় সুখ দুঃখ অনুভব করা, কারোর উপর রাগ করা বা হিংসে করা এসব রোবু পারেনা।

গিরিডি শহর থেকে সোজা চলে আসা যাক জাপানের ওসাকা শহরে। সারা পৃথিবী থেকে আসা তিনশোর উপর বৈজ্ঞানিক ও শ'খানেক সাংবাদিকের সামনে সফল ডেমোস্ট্রেশন হল প্রফেসর শঙ্কু ও ছ'জন সহ-বিজ্ঞানীর তৈরি কম্পুর, ফুটবলের আকৃতির একটি কম্পিউটার যন্ত্র যা ৫০ কোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, ব্রিজ ও দাবা খেলতে পারে, গান শুনে সুর বেসুর বিচার করতে পারে, রাগ রাগিনী বলে দিতে পারে, এমনকি রোগীর অবস্থার বর্ণনা শুনে আরোগ্যের সম্ভাবনা শতকরা কত ভাগ সেটাও বলতে পারে। আর এই সব কিছু সে করে তার যান্ত্রিক মস্তিষ্কের ভেতর থাকা ১০ কোটি সার্কিট ও দশ হাজার কোটি নিউরনের সাহায্যে।

কিংবা ধরা যাক ১৯৯৯ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র "বাইসেন্টিনেয়াল ম্যান" এর রোবট অ্যান্ড্রুর কথা, যে প্রায় সমস্ত কাজই করতে পারত একজন মানুষের মত। আর এই উদাহরণগুলো এখন কল্পবিজ্ঞানের পাতা থেকে উঠে এসে বাস্তবের দরজায় কড়া নাড়ছে। সৌজন্যে, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সংক্ষেপে অও। রোবু, কম্পুরা এখন চ্যাটবোট, DALL-E র রূপ নিয়ে মাত করছে ডিজিটাল দুনিয়া। প্রেমের পদ্য থেকে বিরহের উপন্যাস, রান্নার রেসিপি থেকে রসায়নের ফর্মুলা, জটিল অঙ্ক বা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং থেকে আদিম ইতিহাস - প্রশ্ন আপনার আর শব্দে বা ছবিতে যুৎসই

উত্তর দেবে এরা। বিখ্যাত এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নের ৯৯% এর সঠিক উত্তর দিতে সফল চ্যাট জিপিটি, ওপেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (OpenAI) দ্বারা চালিত চ্যাটবোট। আবার শুধু আপনার লেখা বর্ণনা শুনে হুবহু ছবি তৈরি করতে পারে DALL-E। আর এই কারণে পুলিশ মহলে এর জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা শুনে সন্দেহভাজনের ছবি আঁকার পদ্ধতিটি বহু প্রাচীন। এখন চিত্রশিল্পীর পাশাপাশি DALL-E ও এই কাজে সাহায্য করছে। যদিও এক্ষেত্রে আরও অনেক উন্নতি করতে হবে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর এই প্রয়োগটিকে। কিন্তু সব মিলিয়ে বলা যায় এরাই এখন মুহূর্তের মুশকিল আসান, ঘন্টার পর ঘন্টা গুগল সার্চের সম্ভাব্য অবসান। এমনকি পরমাণু বোমার ফর্মুলা জিজ্ঞেস করলেও মুহূর্তে তা বলে দিতে পারে চ্যাট জিপিটি। প্রশ্নকর্তাকে প্রশ্নের ভুলও ধরিয়ে দিতে পারে। ফলত জন্মের পর মাত্র দু মাসেই অনুরাগীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১০ কোটি, যার জন্য ফেসবুক সময় নিয়েছিল সাড়ে চার বছর, হোয়াটসঅ্যাপ সাড়ে তিন বছর আর google নিয়েছিল প্রায় এক বছর।

কিন্তু কি এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা? অক্সফোর্ড এর সংজ্ঞা বলছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হল কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক উন্নতি যেটা করতে সাধারণভাবে মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ এযাবৎকাল যে সমস্ত কাজ মানুষের বুদ্ধিমত্তা ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না এখন কম্পিউটারও তার নিজের "বুদ্ধিমত্তা"র সাহায্যে করে ফেলছে তার অধিকাংশ।

কিন্তু কি করে সম্ভব সেটা? আমরা, মানুষরা, যখন ছোট থেকে বড় হই নিজের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে, নিজের করা ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আশপাশের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিই। তেমনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষ অ্যালগরিদম ব্যবহার করে বিপুল সংখ্যক তথ্যের যৌক্তিক বিশ্লেষণের দ্বারা ঘটনা ক্রমের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ছন্দ খুঁজতে চেষ্টা করে এবং তার ওপর ভিত্তি করে মানুষের সক্রিয় সাহায্য ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভান্ডার যে কাজটা করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে সেটা করে তথ্য ভান্ডার। মানুষের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র যার গঠনগত উপাদান হলো নিউরন। আর একইভাবে AI এর ক্ষেত্রে তথ্যের বিশ্লেষণ হয় নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে।

কিভাবে কাজ করে এই নিউরাল নেটওয়ার্ক? এক কথায় এর উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় মেশিন লার্নিং আর ডিপ লার্নিং এর মাধ্যমে। মেশিন লার্নিং হল এক ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যা একটি কম্পিউটারকে পূর্ব নির্ধারিত কোন প্রোগ্রাম ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা ঘটনাক্রম কে বিশ্লেষণ করতে শেখায়। আমাদের মস্তিষ্ক যেভাবে সময়ের সাথে সাথে কোন একটি নির্দিষ্ট কাজে ক্রমাগত পারদর্শী হয়ে ওঠে মেশিন লার্নিং ও তেমনভাবেই আরও আরও বেশি তথ্য বিশ্লেষণ করে সময়ের সাথে সাথে নিজেকে আরও নিখুঁত করে তুলতে সক্ষম। এর প্রথম পদক্ষেপ হল, যে কাজটা করতে হবে সে সম্পর্কিত অসংখ্য তথ্য বিভিন্ন মাধ্যম যেমন সেন্সর, ডাটাবেস, ওয়েব ক্রলার ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করা। এরপর উপযুক্ত একটা মডেলের সাহায্য নিতে হয়, যেমন regression, classification, clustering ইত্যাদি। হাতে থাকা কাজটির জন্য কোন মডেলটা কার্যকরী সেটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিজেই ঠিক করে নেয়। প্রতিটা মডেলের অনুমেয় বা কাঙ্খিত আউটপুট আর বাস্তবে

৮ >>

>>১...বেল

একদিন। আইনস্টাইন আর পায়াস ইনস্টিটিউট থেকে ওঁদের কোয়ার্টার্সে ফিরছিলেন। হঠাৎ পথে পায়াসকে থামিয়ে আইনস্টাইন প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, তুমিও কি বিশ্বাস করো যে, তুমি তাকিয়ে না-দেখলে, চাঁদটা আকাশে নেই?

এই আইনস্টাইন ইনস্টিটিউটের দুই সহকর্মী বরিস পোদোলস্কি এবং নাথান রোজেন-এর সঙ্গে ১৯৩৫ সালে এক পেপার লেখেন 'ফিজিকাল রিভিউ' জার্নালে। পেপারটি ওই তিন বিজ্ঞানীর উপাধির আদ্যক্ষরে ই-পি-আর পেপার নামে খ্যাত। পেপারের উদ্দেশ্য? আর কি, কোয়ান্টাম মেকানিক্স যে বাস্তবের অসম্পূর্ণ বর্ণনা, তা দেখানোর জন্য।

বেল ই-পি-আর পেপার পড়ে উৎসাহিত। ১৯৬৪ সালে তিনি এক পেপার লেখেন। ওই পেপারে তিনি অসাম্যের ব্যাপারটা উল্লেখ করেন। বেল দেখান, যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের এক্সপেরিমেন্ট একটা সীমার ঊর্ধ্বে ওঠে, তাহলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স-তত্ত্বটা যতই আজগুবি কথা বলুক-ঠিক। আর যদি ওই সীমার নিচে থাকে, তাহলে ই-পি-আর পেপারে তোলা আপত্তি ঠিক। সীমা বলেই ওই অসাম্য কথাটা এসেছে।

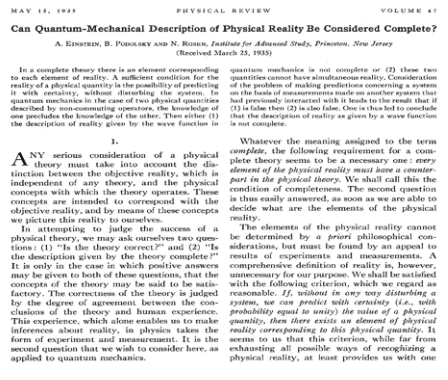

MAY 15, 1935 PHYSICAL REVIEW VOLUME 47

Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?

A. EINSTEIN, B. PODOLSKY AND N. ROSEN, *Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey*

(Received March 25, 1935)

In a complete theory there is an element corresponding to each element of reality. A sufficient condition for the reality of a physical quantity is the possibility of predicting it with certainty, without disturbing the system. In quantum mechanics in the case of two physical quantities described by non-commuting operators, the knowledge of one precludes the knowledge of the other. Then either (1) the description of reality given by the wave function in quantum mechanics is not complete or (2) these two quantities cannot have simultaneous reality. Consideration of the problem of making predictions concerning a system on the basis of measurements made on another system that had previously interacted with it leads to the result that if (1) is false then (2) is also false. One is thus led to conclude that the description of reality as given by a wave function is not complete.

1.

ANY serious consideration of a physical theory must take into account the distinction between the objective reality, which is independent of any theory, and the physical concepts with which the theory operates. These concepts are intended to correspond with the objective reality, and by means of these concepts we picture this reality to ourselves.

In attempting to judge the success of a physical theory, we may ask ourselves two questions: (1) "Is the theory correct?" and (2) "Is the description given by the theory complete?" It is only in the case in which positive answers may be given to both of these questions, that the concepts of the theory may be said to be satisfactory. The correctness of the theory is judged by the degree of agreement between the conclusions of the theory and human experience. This experience, which alone enables us to make inferences about reality, in physics takes the form of experiment and measurement. It is the second question that we wish to consider here, as applied to quantum mechanics.

Whatever the meaning assigned to the term *complete*, the following requirement for a complete theory seems to be a necessary one: *every element of the physical reality must have a counterpart in the physical theory.* We shall call this the condition of completeness. The second question is thus easily answered, as soon as we are able to decide what are the elements of the physical reality.

The elements of the physical reality cannot be determined by *a priori* philosophical considerations, but must be found by an appeal to results of experiments and measurements. A comprehensive definition of reality is, however, unnecessary for our purpose. We shall be satisfied with the following criterion, which we regard as reasonable. *If, without in any way disturbing a system, we can predict with certainty (i.e., with probability equal to unity) the value of a physical quantity, then there exists an element of physical reality corresponding to this physical quantity.* It seems to us that this criterion, while far from exhausting all possible ways of recognizing a physical reality, at least provides us with one

ক্লাউসার, আসপেক্ট আর জাইলিংগার এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছেন। সেই জন্যই ওঁদের নোবেল প্রাইজ। আর ওঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে প্রশস্ত হচ্ছে কোয়ান্টাম ইনফরমেশন টেকনোলজির পথ। কোয়ান্টাম ইনফরমেশন টেকনোলজি কী? এমন ইন্টারনেট, যা হ্যাক করা যাবে না।

পথিক গুহ
বরিষ্ঠ সাংবাদিক ও বিজ্ঞান লেখক

>>১...বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল

এখন অনেক রিসার্চ অ্যান্ড ডিভেলপমেন্ট হয়েছে। রেস্ট্রিকশনস এসেছে স্পেশালি ইন রেসপেক্ট অফ প্রোটেকশন অফ মেরিন এনভায়রনমেন্ট, প্রিভেনশন এ্যান্ড কন্ট্রোল।

আমাদের সংবাদ বিভাগ কিন্তু বন্ধ হয়নি। কাজের চাপ প্রচুর। বাড়ি যাতায়াত করাও অনিয়মিত হয়ে যায় আলাপ করাতো দূরের কথা। দেখা সাক্ষাৎই প্রায় হত না ।

যাইহোক, লাঞ্চ ও কফি ব্রেকের মধ্যে একটু একটু করে আলাপ হতে থাকে। ওঁর কাছেই শুনেছিলাম সাউথ আমেরিকার বাহামা পোর্ট থেকে সিঙ্গাপুরে পাড়ি দেবার সময় মাঝ সমুদ্রে এক ভয়ঙ্কর দূর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। সব থেকে কাছের বন্দর কলম্বিয়া থেকে মেডিক্যাল হেল্প চাইতে তারা এয়ার লিফেটের মাধ্যমে হাসপাতালে ওঁকে স্থানান্তরিত করে। কিন্তু বহু চেষ্টা এবং চিকিৎসা করেও ওঁর শারীরিক ক্ষতি এড়ানো যায়নি। হয়ে যায় তাঁর মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনের ইতি।

কিন্তু মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ভবিষ্যতের সবকিছু অন্ধকার হয়ে যাবে মেনে নেওয়া সত্যিই মুস্কিল ছিল। যেন মাঝ সমুদ্রে সাঁতার কাটা। তবে তিনি দমেননি। ওঁর সাহসী মানসিকতার জন্যই হয়ত আবার তিনি নতুন করে বাঁচার আলো দেখার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন।

এরই মাঝে শিল্পকর্মেও মন দিলেন। প্রতি বছর আমার জন্মদিনে সকাল আটটায় ঘরে ঢোকার আগেই তাঁর হাতে তৈরী জন্মদিনের শুভেচ্ছা কার্ড আমাকে

পৌঁছে দিতে ভুল হতো না। সবার জন্মদিনেই এরকম উপহার আসত। অথবা আসত সাধারণ নুড়ি পাথর দিয়ে অসাধারণ শিল্পকৃতি।

হয়তো ঐ শারীরিক অবস্থা নিয়ে আমেরিকান সেন্টারের কাজে তাঁর অসুবিধা হচ্ছিল। ছেড়ে দিলেন। আমরা আর সে রকম জন্মদিনের কার্ড আর পেতাম না।

এর পর বহুদিন তাঁর সাথে যোগাযোগ হয়নি। হঠাৎ খবর পেলাম তিনি অসুস্থ। ওঁকে দেখতে যাওয়া বাদ সাধল করোনা। বছর খানেক বাদে হঠাৎ করেই চোখে পড়ল ফেসবুকে মল্লিক সাহেবের পেবল আর্ট। ফোন করলাম।

জানলাম "বাড়িতে বসে মনটাকে ভালো রাখতে চেষ্টা করি। তাই সত্যজিৎ রায়ের ১০০ বছরে তাঁর তৈরি ২৯ টি বাংলা সিনেমার পোস্টার পথের পাঁচালী থেকে আগন্তুক নিয়ে সময় কাটাতে চেষ্টা করলাম নুড়ি পাথরের ২৯টি পোস্টার"। এগুলি ওঁর বাড়িতে নানা দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে। এটিই এক অনুপম প্রদর্শনী। ভাবা যায়? "এগুলোই আমার ভালো থাকার ভিটামিন," শেষে বললেন। এরপরেও ওঁকে কি ভোলা যায়? ভোলা যায় না এই অসাধারণ সাক্ষাৎকারটি এক অসাধারণ মানুষের কাছ থেকে। শরীরটা খুব ভালো ছিল না। তাও আমাদের অনুরোধে এ কথাগুলি শোনাতে রাজি হয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর ওঁকে কিই বা জানাতে পারি? ভালো থাকুন মল্লিক সাহেব!

প্রশান্ত কুমার বসু
সম্পাদক,
বিজ্ঞান কহন
boseprasanta@hotmail.com

মশা কাকে বেশি কামড়ায়?

অমিত কৃষ্ণ দে

অনেক সময় দেখা যায় কোন একজনকে বেশিরভাগ সময় মশা বেশি কামড়ায়। এর কি সত্যি কোনো কারণ আছে না পুরোটাই মনের ভুল ধারণা? এর উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে গবেষকরা দেখেছেন যে মানুষের শরীর থেকে বিশেষ কিছু ধরনের রাসায়নিক পদার্থ বেরোয় যা সাধারণত এই মশা গুলিকে তাদের দিকে আকর্ষণ করে। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থ গুলি অনেক সময় অন্যের তুলনায় বেশি বের হয়। তাই তাদের মশা বেশি রকম কামড়ায়।

জন্তু-জানোয়ারদেরও গায়ে যেমন গন্ধ আছে তেমনি মানুষের গা থেকেও গন্ধ বের হয়। যে ঘাম বের হয় শরীর থেকে তা সাধারণত গন্ধহীন হয়। কিন্তু এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যেগুলি এই ঘামের ভেতর থাকা প্রোটিনের উপর কাজ করে ও তার থেকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ বার করে। এই পদার্থগুলি অনেক সময় অন্য সবাইয়ের কাছে দুর্গন্ধময় মনে হয়। এই ধরনের ব্যাকটেরিয়া সবসময় শরীরের বিভিন্ন চামড়ার অংশে পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ কিছু রোগের ক্ষেত্রে এই ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে যায়।

শরীরের গন্ধ নিম্নলিখিত জায়গায় থাকতে পারে: পা, কুঁচকি, বগল, যৌনাঙ্গ, কানের পিছনে,ইত্যাদি জায়গায়। কিছু কিছু জায়গা যেখানে কাপড় দিয়ে বেশিরভাগ সময় ঢাকা থাকে সেই সকল জায়গাগুলি বর্ধিত আর্দ্রতা এবং ফ্যাব্রিকে আটকে থাকা ঘামের সংমিশ্রণ ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। এর ফলে শরীরের ঐ সকল জায়গায় দুর্গন্ধ হতে পারে।

ঘামে জল, খনিজ পদার্থ (সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম), ল্যাকটেট এবং ইউরিয়া থাকে। ঘামের রাসায়নিক গঠন ব্যক্তিদের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। এটাও নির্ভর করে ব্যক্তিরা কী খাচ্ছেন এবং পান করছেন, কেন ঘামছেন (উদাহরণস্বরূপ, ব্যায়াম বা জ্বর), কতক্ষণ ধরে ঘামছেন, সেইসাথে অন্যান্য অনেক কারণের ওপরও। ডেঙ্গি, চিকুনগুনিয়া, জিকা, পীতজ্বরের বাহক মশা এডিস ইজিপ্টাইয়ের (Aedes aegypti) উপরে তিন বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে সাত মার্কিন বিজ্ঞানী নিশ্চিত হয়েছেন, ত্বক থেকে নিঃসৃত এক ধরনের রাসায়নিকের গন্ধই এ ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়। থাকে শরীরের তাপ ও অন্যান্য কিছু কারণও। যাদের এই ফ্যাক্টরগুলি বেশি, তারাই 'মসকুইটো ম্যাগনেট' হয়ে পড়ে।

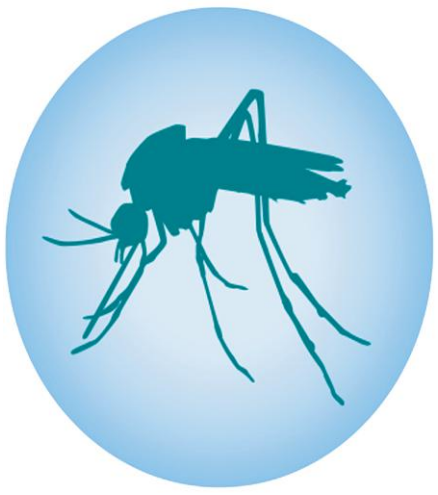

গবেষণাপত্রটি প্রবন্ধ আকারে বিখ্যাত বিজ্ঞানপত্রিকা 'সেল'-এ সম্প্রতি প্রকাশিত হতেই আলোড়ন পড়েছে। প্রবন্ধের দুই মুখ্য লেখক নিউ ইয়র্কের রকফেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোজেনেটিক ল্যাবরেটরির লেসলি ভোসহল এবং হোয়ার্ড হিউগস মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের মারিয়া ডি-ওবাল্ডিয়া জানাচ্ছেন, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড নামের এক গোত্রের রাসায়নিকের আকর্ষণেই ধেয়ে আসে মশককুল। গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে যে মশারা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের প্রতি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট, যার মধ্যে রয়েছে বুটিরিক অ্যাসিড। এই কার্বক্সিলিক অ্যাসিডগুলি মানুষের ত্বকে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা উৎপাদিত হয় এবং মশাদের আকৃষ্ট করে। মশা আমাদের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে তাপ এবং জলীয় বাষ্প সনাক্ত করতে পারে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মশা কাছাকাছি পছন্দসই তাপমাত্রার দিকে চলে যায় । আমরা যখন শ্বাস ছাড়ি তখন আমরা সবাই কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করি। আমরা যখন সক্রিয় থাকি, যেমন ব্যায়ামের সময় আমরা আরও বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদন করি।

শুধুমাত্র তাপমাত্রার বৈষম্য নয়, মশা তাদের পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিবর্তনও সনাক্ত করতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে যে বিভিন্ন মশার প্রজাতি কার্বন ডাই অক্সাইডে ভিন্নভাবে সাড়া দিতে পারে। কার্বন ডাই অক্সাইডের বৃদ্ধি একটি মশাকে সতর্ক করতে পারে যে একটি সম্ভাব্য হোস্ট কাছাকাছি রয়েছে। মশা তখন তার দিকে চলে যাবে।

এগুলো ছাড়া, মশারা কিছু লোককে অন্যদের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় মনে করে। কার্বন ডাই অক্সাইড বা ঘামের গন্ধ বা ত্বকের ব্যাকটেরিয়া ছাড়া গাঢ় পোশাক, রক্তের ধরন, গর্ভাবস্থা, এবং বিয়ার খাওয়া এমন কিছু বিষয় গবেষকরা খুঁজে পেয়েছেন যা মশাকে আকৃষ্ট করে। সুতরাং কেন কিছু মানুষকে মশা বেশি কামড়ায় তার কারন এখন পরিষ্কার বোঝা যায়।

অমিত কৃষ্ণ দে
অবৈতনিক সচিব,
ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এ্যাসোসিয়েশন
ade59247@gmail.com

পরিবেশ হারাচ্ছে জলাভূমি, মাছ, জীবিকা

সূর্য্যেন্দু দে

১৯৭১ সালে ইরানের র‍্যামসার শহরে জলাভূমির গুরুত্ব নির্ধারণের আন্তর্জাতিক অধিবেশনে ভীষণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল জলাভূমির ওপর। তারপর অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু আমরা যেন জলাভূমির গুরুত্বের কথা ভুলে যেতে বসেছি। এরাজ্যে জলাভূমির সংখ্যা অসংখ্য। কিন্তু বাস্তবে সেই সংখ্যা দিন দিন কমেই চলেছে। দেখা গেছে সত্তরের দশকে রাজ্য মৎস্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী এ রাজ্যে বিল এলাকা ছিল দু'লক্ষ একর (৮০,০০০ হেক্টর), যা কেন্দ্রীয় সংস্থার তথ্যে ওই শতাব্দীর শেষে দাঁড়িয়েছে ৪২,০০০ হেক্টর মতো। দ্রুত নগরায়ণ, রাস্তাঘাট নির্মাণে এই পরিমাণ নিশ্চিত ভাবে আজ আরো কমে গেছে।

এ রাজ্য হল অনেকগুলি নদ নদীর লীলাক্ষেত্র। নদীগুলি বইতে বইতে বারবার খাত পরিবর্তন করে। বইতে শুরু করে নতুন খাতে। পুরাতন ফেলে আসা খাতগুলোতে জন্ম নেয় বিল, বাংলায় তাই বিলের ছড়াছড়ি। পুরাতন ফেলে আসা খাতকে নদী সহজে ভোলেনা। সারাবছর না হোক বর্ষার জলে বিলগুলি ফুলে-ফেঁপে ওঠে।

বর্ষার নতুন জল ঢোকার ফলে বিলগুলির দূষিত জল দূর হতো, দূর হতো পলিও। বর্ষার নদীর জলের সাথে আসা বিভিন্ন দেশি মাছের ডিমপোনা বিলে ঢুকে জুপ্লাকটন ফাইটোপ্লাংটন খেয়ে বড় হতো। দেশি মাছেদের আকর ছিল বিলগুলি। সেখানে ডিম পোনা আলাদাভাবে ছাড়তে হতো না, দিতে হতো না, পরিপোষক খাবারও।

দীর্ঘদিন খালবিলগুলির উৎসমুখ সংস্কারের অভাবে সেগুলির অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে চলেছে। এখন বিলে জল ঢোকে না, বিলের সজীব ভাব নষ্ট হয়ে গেছে, পাট পচানো দূষণে জর্জরিত, পলি ভরাট, ধ্বংসের মুখে মাছেদের প্রজনন ক্ষেত্রগুলি। ভাণ্ডারদহের উৎসমুখ ২০০০ সালের বন্যার সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ইন্দিরা আবাস যোজনায় ৫-৭ টি বাড়িও তৈরি হয়েছে। আগে অতি বর্ষণের দিনগুলোতে ধানখেতের চুনো চিংড়ি খালে, বিলে এসে জমা হতো। সবুজ বিপ্লবের কারণে কৃষিবিষে জর্জরিত ধান খেতের মাছগুলো আজ অবলুপ্ত। সেখানকার মাছ আর খাল-বিলে আসে না। এই কৃষিবিষ জলের মাধ্যমে নিকটবর্তী খাল-বিলে পড়লে বিলের জল দূষিত হয়। মাছেদের জীবন বিপন্ন হয়। কলকারখানার বর্জ্যে বিলের জল দূষিত হয়, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়।

বিলগুলি জবরদখল এখন এক জ্বলন্ত সমস্যা। স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজন অর্থ বলে অথবা বাহুবলে সরকারি খাল দখল করছে। সেখানে তারা ছোট ছোট পুকুর কেটে নিজ উদ্যোগে মাছ চাষ করে, পুকুরগুলোর চারিদিকে জাল দিয়ে ঘিরে ডিমপোনা ফেলে মাছ চাষ করে। মাছ বাজারে চালান দেয়। এইজন্য আজ অনেক বিলে ডাক বন্ধ আছে। আজকাল জলকরগুলির দাম ৭০-১০০ গুণ বেড়েছে। অন্যদিকে জলকরের জলার পরিমাণও কমে যাচ্ছে। সেই কারণেই এ রাজ্যের অনেক জলাশয়ে ডাক হয়নি সেগুলি পতিত হয়ে পড়ে আছে। এতে বিলে মাছের উৎপাদন আরো অনেক কমে গেছে, জেলে হারাচ্ছেন জীবিকা।

এমন পরিস্থিতিতে একদল নব্য মৎস্যজীবী কিছু কিছু জলাভূমি বড়ো অঙ্কের টাকা লগ্নি করে লিজ নিয়েছে। আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে বড় বড় মাছ উৎপাদন করছে। নিজেদের জাল দিয়ে শ্রমিকদের দ্বারা মাছ ধরে। এই মাছ বাজারে বিক্রি করে বড় মুনাফা করে। এই মাছ ধরা লোকেরা জেলে নয়, এরা মৎস্য শ্রমিক।

এখানে মাছ ধরতে কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। জেলে জীবিকা বিপন্ন। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় ১/৩ অংশ পুষ্করিণী মজে গেছে। এখন সেগুলি পতিত, যেন আস্তাকুঁড়, দূষণ ছড়ানো কেন্দ্র। ১/৫ অংশ পুষ্করিণীর অবস্থাও ভালো নয়। এখানে তেমন মাছ চাষ হয় না। ২/৫ অংশে গতানুগতিক মাছ চাষ হয়। মাত্র ১/১০ অংশ পুকুরে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ হয়। এতে জেলে জীবিকা অবলুপ্তির মুখে।

আগে ৩-৪ বছর অন্তর পুষ্করিণীগুলির পাঁক তুলে ফেলে পরিষ্কার করা হতো। এই পাঁক গরুর গাড়ি করে দূরের জমিতে দেওয়া হতো। এই পাঁক জৈব উপাদানে ভরপুর, জমির উর্বরতা বাড়াত, ভূমিক্ষয় রোধ করত। তখন রাসায়নিক সারের ব্যবহার ছিল না বললেই চলে।

সবুজ বিপ্লবের সময় রাসায়নিক সারের ব্যবহার বেড়ে গেলে পুকুর পুষ্করিণীর পাঁক তোলা বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে দিনমজুরের পারিশ্রমিক বেড়ে গেল, কমে গেল, বলদ গরু ও গাড়ির সংখ্যা। এই জলাভূমি গুলি বাংলার এক বড়ো সম্পদ। লকডাউন এর সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের দিয়ে এগুলি সংস্কার করলে অসময়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ পেত, আমরা পেতাম এক নির্মল পরিবেশ। জলাভূমিগুলি সংস্কার হলে দেখানকার জলে কৃষক করত ধান চাষ, জেলে করত মাছ চাষ। বাংলা আবার হয়ে উঠত সুজলা সুফলা।

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক,
জেমো এন. এন. হাই স্কুল, মুর্শিদাবাদ এবং
মৎস্য গবেষক

একটি বিশাল প্রশ্ন

প্রতাপ চ্যাটার্জী

কেরল যদি পারে, বাকি রাজ্যগুলি কেন পারবে না? এপ্রিলের মাঝামাঝিতেই সূর্যের প্রখর উত্তাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাপমাত্রার পারদ ছুঁয়েছে ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চিকিৎসকদের পরামর্শ, খুবই প্রয়োজন না থাকলে দ্বিপ্রহরে বাড়ির বাইরে না বেরোতে এবং সারাদিনে কমপক্ষে অন্তত ৪ থেকে ৫ লিটার জল পান করতে।

কিন্তু UN WORLD WATER REPORT ২০২৩- এর রিপোর্ট তো আমাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট! রিপোর্টে বলা হচ্ছে, বিশ্বের ২৬ শতাংশ মানুষ পরিশ্রুত পানীয় জল পান না। এই রিপোর্টে আরও জানানো হচ্ছে যে,সমগ্র বিশ্ব জুড়ে প্রায় ৮০ শতাংশ বর্জ্য জল শুদ্ধ করার কোনো প্রকার ব্যবস্থা না করেই পরিবেশের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কেরল-ই ভারতের মধ্যে প্রথম রাজ্য যে নিজ রাজ্যবাসীকে গ্রীষ্মকালীন জলসংকট থেকে রক্ষার জন্য জল বাজেট ঘোষণা করলো। এই বাজেটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কেরলের ১৫ টি ব্লকের ৯৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত।

এখন প্রশ্ন হলো কেরলে যথেষ্ট জলভান্ডার (৪৪টি নদী, অসংখ্য পুকুর, হ্রদ,জলাশয়) থাকা সত্ত্বেও গ্রীষ্মকালীন জল সংকটের কারণ ঠিক কী? প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, জলভান্ডারের ঠিকমতো সংরক্ষণ ও তদারকি করার ব্যবস্থা না থাকার জন্যেই কেরলকে বেশ কয়েক বছর ধরে গ্রীষ্মকালীন জলসংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। অর্থাৎ, প্রশাসন তাদের ব্যর্থতা কার্যত মেনে নিয়েছে। এবার যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা দরকার তা হলো, ঠিক কীভাবে কাজ করবে এই জল বাজেট সংক্রান্ত নীতি এবং পরিকল্পনা। এক্ষেত্রে প্রশাসনের থেকে জানানো হয়েছে,যে সমস্ত অঞ্চল জল সংকটে ভুগছে সেইসমস্ত অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পৌঁছে দেওয়া হবে আর এই জল পৌঁছে দেওয়া হবে,যেই সমস্ত অঞ্চলে উদ্বৃত্ত অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পরিমাণে জল আছে সেই সমস্ত অঞ্চল থেকে জল সংগ্রহ করে। এছাড়া জলের অপচয় যাতে বন্ধ করা যায় সেই মতো রাজ্যবাসীকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

এখন যে কথা বলার জন্যে এই আলোচনা তা হলো কেরল যদি নিজ রাজ্যবাসীকে জলসঙ্কট থেকে রক্ষা করার জন্যে জল বাজেট ঘোষণা করতে পারে সেখানে অন্যান্য রাজ্যগুলি কেন সেই একই কাজ করতে পারছে না? বিশেষ করে যেখানে WWF এর WATER RISK FILTER এর গবেষণা বলছে ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের ৩০ টি শহরে উল্লেখজনকভাবে বাড়তে পারে জল সংক্রান্ত ঝুঁকি। ততদিন কি এই প্রশ্ন একই ভাবে থাকবে?

ট্রেনি-টিচার
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ,হুগল

কেরালার প্রথম জল বাজেটের উন্মোচন করছেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন

কলকাতায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

সৈকত কুমার বসু

পাঁচই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পরিবেশের জন্য সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক দিবসগুলির মধ্যে একটি। টঘউচ এর নেতৃত্বে এবং ১৯৭৩ সাল থেকে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হওয়া এই ইভেন্টটি পরিবেশগত প্রচারের জন্য আজ সর্ববৃহৎ বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে, যেখানে সারা বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই গ্রহটিকে রক্ষা করার জন্য জড়িত।

বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সুশীল সমাজ, ব্যবসা এবং সরকারগুলি এবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে প্লাস্টিক দূষণের সমাধানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, নেদারল্যান্ডের সমর্থনে আইভরির আবিদজানে আনুষ্ঠানিক উদযাপনের মাধ্যমে। ফ্রান্সে প্লাস্টিক দূষণের অবসান ঘটানোর জন্য একটি বৈশ্বিক চুক্তির দ্বিতীয় দফা আলোচনার সাম্প্রতিক সমাপ্তির পর এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্লাস্টিক দূষণের সমাধানের উপর ফোকাস করা বিশেষভাবে সময়োপযোগী। ২০২৩ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ৫০ তম বার্ষিকী চিহ্নিত করা হয়, ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। বিগত পাঁচ দশক ধরে, জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি)- এর নেতৃত্বে, দিনটি বিশ্বের অন্যতম দিবসে পরিণত হয়েছে। পরিবেশগত প্রচারের জন্য বৃহত্তম বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে।

বিশ্বজুড়ে কয়েক কোটি মানুষ অনলাইনে এবং ব্যক্তিগত কার্যকলাপ, ইভেন্ট এবং ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস আমরা বর্তমানে যে জরুরী চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হচ্ছি তা তুলে ধরতে সাহায্য করে। জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি এবং দূষণের মতো চ্যালেঞ্জ। প্লাস্টিক দূষণ সেই তিনটি চ্যালেঞ্জকেই স্পর্শ করে বলে, "নেদারল্যান্ডের পরিবেশ মন্ত্রী ভিভিয়ান হেইজেন উল্লেখ করেছেন।

"এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা সচেতনতা বৃদ্ধি, সর্বোত্তম অনুশীলন সংগ্রহ এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি আশা করি বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এই সংস্করণটি প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত লড়াইয়ে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে প্রমাণিত হবে।"

সারা দুনিয়ায় বার্ষিক ৪৩০ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক উৎপাদন হয়, যার দুই-তৃতীয়াংশ স্বল্পস্থায়ী পণ্য, যা শীঘ্রই বর্জ্য হয়ে যায়। যদিও প্লাস্টিক দূষণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক খরচ প্রতি বছর $৩০০ থেকে US$৬০০ বিলিয়নের মধ্যে। একটি সাম্প্রতিক ইউএনইপি রিপোর্ট অনুসারে, যদি বিভিন্ন দেশ এবং কোম্পানিগুলি বিদ্যমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে গভীর নীতি এবং বাজার পরিবর্তন করে তবে ২০৪০ সালের মধ্যে প্লাস্টিক দূষণ ৮০ শতাংশ হ্রাস পাবে।

এ দিনের অনুষ্ঠান কলকাতার শ্রী শিক্ষায়তন কলেজের - বাংলা, রসায়ন এবং এনএসএস ইউনিটের সাথে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ ২০২৩ থিম #BEAT PLASTIC POLLUTION অনুসারে

দিবসটি পালন করেছে। প্রথম অধিবেশনে বক্তা ছিলেন: ডি.আর. প্রতীক সত্য, প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট, আইসিএআর-সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর জুট অ্যান্ড অ্যালাইড ফাইবারস, ব্যারাকপুর! উনি "জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন: প্রাকৃতিক তন্তুর ভূমিকা" এই বিষয়ে আলোকপাত করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষার্থীদের ইভেন্ট অন্তর্ভুক্ত ছিল যেমন- পোস্টার / ডুডল আর্ট / এক্সটেম্পোর / রিসাইকেল প্লাস্টিক মডেল বিভিন্ন সাব- থিম-এর উপর। যেমন, i) প্লাস্টিক এবং জলবায়ু পরিবর্তন ii) প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ররর) গঙ্গা নদীতে মাইক্রোপ্লাস্টিক iv) প্লাস্টিক ছাড়া জীবন, v) প্লাস্টিক - সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের জন্য হুমকি vi) প্লাস্টিক এবং স্বাস্থ্যের ঝুঁকি।

শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ সহ কলকাতার বিভিন্ন কলেজের প্রায় ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্ভাবনী দক্ষতার সাথে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। শ্রী শিক্ষায়তন কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ অদিতি দে ছাত্র-ছাত্রীদের পারফরম্যান্স এবং অনন্য ধারণার জন্য সার্টিফিকেট এবং সেরা উপস্থাপনা পুরস্কার তুলে দেন।

বিজ্ঞানী,
লেথব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়,
কানাডা
saikat.basu@alumni.uleth.ca

গন্ডার, নামটা শুনলে মনে হয় কুৎসিত দেখতে, একটা শিং সমেত, মোটা চামড়ার একটা বন্যপ্রাণী। কিন্তু তাতেও গন্ডারের রক্ষে নেই। চোরাশিকারির দল এই গন্ডারকে খুব পছন্দ করে। পশুশিকারী আর চোরাচালানকারীদের বন্যপ্রাণি শিকারের কুৎসিত সত্যকে ফের একবার সামনে এনে দিল পৃথিবী জুড়ে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিও।

ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, মাটিতে পড়ে রয়েছে মৃত মা গণ্ডার, কোনও সাড়া না পেয়ে বাচ্চা গণ্ডারটি বারেবারে মাকে ঠেলে জাগানোর চেষ্টা করছে। ভিডিওতে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে, শিং ভেঙ্গেতো নিয়েই গেছে। শিঙের প্রয়োজনে তাকে মেরেও ফেলে দিয়ে গেছে। মৃত মা গণ্ডারের থেকে দুধ খাওয়ারও চেষ্টা করে চলেছে ওই গন্ডার-শাবক।

সেভ দ্য দ্য রাইনো সংস্থার মতে, বিশ্বজুড়ে সমস্ত গণ্ডারের প্রায় ৮০% রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাতে এবং কেবল ২০১৮ সালেই ৭৬৯টি চোরাশিকারের ঘটনা ঘটেছে।

অন্যদিকে, এই দক্ষিনবঙ্গে এক সময় ১৫০ বছর আগেও চড়ে বেরানো জাভান গণ্ডারকে রক্ষা করা আমাদের সম্ভব হয়নি। বেঁচে থাকা একমাত্র গণ্ডার বেগমকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ব্রিটেনে। গবেষণা বলছে, সুন্দরবনে তৃণাঞ্চলের ঘাটতি ও অবাধ শিকারই ছিল সেদিনের গন্ডার বিলুপ্তির কারণ।

গন্ডারের শিংয়ে কী আছে? মানুষ নিজেই জানেনা, এই শিঙের ওপর তার কেন এত লোভ। সাধারনভাবে, আমাদের চুল, ত্বক বা নখ যা দিয়ে তৈরি, গণ্ডারের শিং একদমই তার বেশি কিছু নয়।

আসলে গণ্ডারের শিং, একসঙ্গে চুল জুড়ে জুড়ে তৈরি হয়। তার সঙ্গে মেশে নাকের গ্রন্থি থেকে বেরনো আঠার মত জিনিস, যার মধ্যে থাকে কেরাটিন নামের একরকমের প্রোটিন। এই আঠাল রস আর চুল পাকিয়ে পাকিয়ে ভীষণ শক্ত হয়ে গিয়ে শিং তৈরি করে।

২০০৬ সালে, ডাঃ নিকো ভ্যান স্ট্রিইন গন্ডার শিং নিয়ে একটি গবেষণা চালিয়েছিলেন। তাতে জানা যায়, সাদা গণ্ডারের শিং ৫৯ ইঞ্চি (১৫০ সেমি), কালো গণ্ডারের শিং ৫১ ইঞ্চি (১৩০ সেমি), সুমাত্রার গণ্ডারের শিং ৩২ ইঞ্চি (৮১ সেমি), ভারতীয় গণ্ডারের শিং ২৩ ইঞ্চি (৫৭ সেমি) আর জাভান গণ্ডারের শিং ১১ ইঞ্চি (২৭ সেমি) হয়। আফ্রিকার সমস্ত প্রজাতির গণ্ডার এবং সুমাত্রার গণ্ডার দুটি শিংওয়ালা। অন্যদিকে ভারতীয় গণ্ডার এবং জাভান গণ্ডারের একটি মাত্র শিং রয়েছে।

চোরা শিং উদ্ধার

আফ্রিকান অ্যান্ড এশিয়ান রাইনো স্পেশালিষ্ট গ্রুপের সমীক্ষা অনুসারে, ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে পৃথিবীতে ১১, ২৮১ কেজি চোরা শিং উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ২,৯৯৪ কেজি, ভিয়েতনাম থেকে ১,৭৫৭ কেজি, চিন থেকে ১,৭১৫ কেজি, মোজাম্বিক থেকে ১,০৩১ কেজি, কেনিয়া থেকে ৪৬৯ কেজি, মালয়েশিয়া থেকে ৪৩০ কেজি, থাইল্যান্ড থেকে ৩২৮ কেজি, কাতার থেকে ৩০৩ কেজি, উগান্ডা থেকে ১৪৯ কেজি, এবং নাইজেরিয়া থেকে ১৪৫ কেজি উদ্ধার হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে, ভারত থেকে গণ্ডারের চোরা শিং উদ্ধার হয়েছে ৫৮ কেজি। ২০১০ এর হিসেবে, গন্ডার শিং কালো বাজারে ২ পাউন্ড প্রতি ২১ হাজার থেকে ৫৪ হাজার ডলারে বিক্রি হয়।

শিঙেই মিথ্যা নজর কেন বিশ্বের অনেক দেশের মানুষের ভুল বিশ্বাস, গন্ডার শিংয়ের ওষধি গুণ আছে। প্রথমেই জেনে নিন, এরকম

গণ্ডার বাঁচান

রাতুল দত্ত

কোনও গুণ নেই। চিন আর ভিয়েতনামে মনে করা হয়,জ্বর কমাতে আর রক্তকে ডিটক্সিফাই করতে নাকি শিঙের গুড়ো কাজ করে! ১৯৯৩ সালে চীন সরকার গণ্ডার শিংয়ের অবৈধ বাণিজ্য নিষিদ্ধ করলে কি হবে! ট্র্যাডিশন ধরে রাখতে, ভুল জেনেও শিং জোগাড়ে চোরাপথে এদের হত্যা চলছেই। গণ্ডার শিং কোনও ক্যান্সার নিরাময়ও করতে পারে না। গণ্ডার শিং দিয়ে কোনও ভাল অলঙ্কারও তৈরি হয়না। অনেকে শক্তি দেখাবার জন্য অমুলক কবজি বা গলায় গণ্ডারের শিঙের কিছু ঝুলিয়ে রাখছেন। ইয়েমেন ও ওমানে ছুরির হাতল তৈরিতে এই শিঙের চাহিদা ভীষণ।

ইউরোপের অনেক দেশে মনে করা হত, গণ্ডারের শিং নাকি জল শোধনও করে। ১৯৭৭ সাল থেকে গণ্ডারের শিঙের ব্যাবসা, আন্তর্জাতিক স্তরে নিষিদ্ধ হলেও, নাকের ডগায় শিঙের জন্য গণ্ডার নিধন চলছেই। নাকফোঁড়া ও মাথা ব্যথা বন্ধ করা থেকে শুরু করে ডিপথেরিয়া নিরাময় এবং খাদ্যে বিষক্রিয়া কমানোর ক্ষমতা, সবকিছুই নাকি গণ্ডারের শিঙে রয়েছে বলে মনে করা হত। বিজ্ঞানীরা বারবার বলেছেন, সব ভুল, সব ভ্রান্ত।

শিং বাঁচাতে ৩টি পথে পৃথিবীতে দ্রুত, চোরা শিকারিদের থেকে গণ্ডারকে বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। ১) গণ্ডার পরিণত হলে, শিঙের ওপর নজর পড়ার আগেই সেই গণ্ডারকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে, সযত্নে শিংটি তুলে নিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। ফলে শিং কেটে নিতে গিয়ে গোটা একটা প্রাণীকেই মেরে ফেলার ঘটনা থেকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। ২) শিঙে গোলাপি রঙের এমন এক রাসায়নিক ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে, যাতে গণ্ডারের কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। কিন্তু অন্য কেউ না জেনে, সেই শিং ধরলেই মৃত্যু। ৩) গণ্ডারের শিং যে যে উপাদানে তৈরি, ঠিক সেই উপাদানেই কৃত্রিম শিং তৈরি করে বাজারে বিক্রির চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে, আসল শিঙের ওপর আকর্ষণ কমছে, আলাদা করাও যাচ্ছে না।

সুন্দরবনে ছিলো জাভান গন্ডার!

১৫০ বছর আগে সুন্দরবন থেকে বিলুপ্ত হয়েছে জাভান গণ্ডার। অতীত নথিপত্র, জেলাভিত্তিক গেজেটিয়ার, ব্রিটিশ শাসন কালে বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের উত্তরে তিস্তা অঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ-র পথ ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমে সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তিন প্রজাতির গন্ডারের বসতি।

সর্বশেষ জীবিত গন্ডারটিকে অর্থের লোভে তৎকালীন বৃটিশ সরকার পাঁচ হাজার পাউন্ডে লন্ডন চিড়িয়াখানায় বিক্রি করে দেয় ১৮৭২ সালে। সুন্দরবন ও যশোর থেকে শিকার করা এমন ১১টি একশিঙি ছোট গন্ডার কলকাতা, বার্লিন ও লন্ডন জাদুঘরে তৎকালীন সময় নিয়ে যাওয়া হয়।

সুন্দরবনে আদি সভ্যতার প্রত্নস্থলের আবিষ্কারক ইসমে আজম(ঋজু)-এর মতে, ১৮৭৬ সালে কুমিল্লায় একটি দুই শিঙি গন্ডার গুলি করে মারা হয় এবং ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম থেকে একটি গন্ডার ধরা হয়। যেটি ছিল দুই শিঙি গন্ডার। এই গন্ডারটিই বাংলাদেশের শেষ জীবিত গন্ডার 'বেগম'।

খুলনার রায়সাহেব নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী শেষ ১৮৮৫ সালে সুন্দরবনে গন্ডারের পায়ের চিহ্ন দেখেছিলেন। বাংলার বারো ভূঁইয়াদের অন্যতম রাজা প্রতাপাদিত্য। বৃহত্তর খুলনা, যশোর, বরিশালের কিছু অংশসহ পুরো সুন্দরবনই ছিল তাঁর রাজ্যের মধ্যে। কথিত আছে তাঁর ৫২,০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল। এরা প্রত্যেকেই ঢাল-তলোয়ার, বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করত। মোটা বলে গণ্ডারের চামড়া দিয়ে ঢাল বানানোর রেওয়াজ দুনিয়ার অনেক দেশেই ছিল। রাজা প্রতাপাদিত্যের সৈন্যদের ঢালগুলোও তৈরি করা হতো গণ্ডারের চামড়া দিয়ে।

সরকারের ভাবনা ডানার জন্য হাঙর শিকার, দাঁতের জন্য আফ্রিকান হাতি আর শিঙের জন্য গণ্ডার শিকার; মানুষের আগ্রাসন এত মারাত্মক রুটিনের আকার ধারণ করেছে যে, 'মেগাফনা' বা বিশালদেহী প্রাণী হলেও এদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে। অতিকায় প্রাণীদের বিজ্ঞানের ভাষায় মেগাফনা বলে ডাকা হয়। সম্প্রতি নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৬০ শতাংশ মেগাফনার অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে এবং এর জন্য দায়ী একমাত্র আমরা। এই বৃত্তে অস্ট্রেলিয়ান কডফিশ, ডাইনোসর, রে-ফিনড মাছ ও কার্টিলেজিনাস মাছ, বিশালাকৃতির উটপাখি ও বন্য ব্যাকট্রিয়ান উট, বিশালদেহী কচ্ছপ, নীল তিমি, জলহস্তী যেমন আছে তেমনি রয়েছে গণ্ডারও। দ্রুত এদের সংরক্ষণ না করলে বিলুপ্ত প্রাণীর তালিকায় আরও একটি নাম যুক্ত হবে।

সহ তথ্য আধিকারিক
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ratulwbgovica@gmail.com

প্রোজেক্ট টাইগার
৫০ বছর করল পার

অলোক ব্যানার্জী

আগামী ২৯শে জুলাই আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস।তার আগেই বাঘ সংরক্ষণে ভারত স্পর্শ করলো সাফল্যের এক নতুন মাইলফলক। সালটা ১৯৭৩-এর ১লা এপ্রিল, ভারতে ক্রমহ্রাসমান বাঘের সংখ্যা ঠেকাতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার গ্রহণ করেছিল 'প্রোজেক্ট টাইগার'।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে টাইগার রিজার্ভ গড়ে তুলে বাঘ সংরক্ষণের কথা বলা হয়। প্রারম্ভিক পর্যায়ে দেশের ৯টি সংরক্ষিত অঞ্চলকে এই প্রকল্পের জন্য বেছে নেওয়া হয়, যথা- বন্দিপুর (কর্ণাটক), করবেট (উত্তরাখণ্ড), কানহা (মধ্যপ্রদেশ), মানস (আসাম), মেলঘাট (মহারাষ্ট্র), পালামৌ (ঝাড়খন্ড), রণথম্বোর (রাজস্থান), সিমলিপাল (উড়িষ্যা), ও সুন্দরবন (পশ্চিমবঙ্গ)।

প্রোজেক্ট টাইগারকে সংবিধিবদ্ধ রূপ দিতে গড়ে তোলা হয় ন্যাশানাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (এন.টি.সি.এ)। এই সংস্থার দায়িত্ব টাইগার রিজার্ভগুলি পরিচালনা, বাঘ পর্যবেক্ষণ-গণনা এবং বাঘ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির দায়িত্বশীলতাকে সুনিশ্চিত করা। ১৯৭৩ সালে প্রোজেক্ট টাইগারের সরকারি ব্যানারে লেখা ছিল "ইন্ডিয়া লিডস টাইগার কনজারভেশন"!সেই স্বপ্ন যেন

পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এগোচ্ছে অর্ধশতক পেরিয়ে।

গত ৯ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কর্ণাটকের বন্দিপুর টাইগার রিজার্ভ থেকে জারি করেন "স্ট্যাটাস অফ টাইগার রিপোর্ট ২০২২"। সহজ কথায় দেশের বাঘশুমারি। আর তাতেই ফুটে উঠেছে প্রোজেক্ট টাইগারের সাফল্যের খতিয়ান। আনুমানিকভাবে ২০২২-এ ভারতে বাঘের নূন্যতম সংখ্যা প্রায় ৩,১৬৭টি। বিশ্বের মোট বাঘের ৭০% রয়েছে আমাদের দেশে যা বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের দিক থেকে খুবই আশাব্যঞ্জক। বর্তমানে দেশে ৫৩টি টাইগার রিজার্ভ রয়েছে।এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে, বিশ্বে বাঘ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সত্যিই 'ইন্ডিয়া লিডস'। আর, এই সাফল্যকে পাথেয় করেই গত ৯ই এপ্রিল কর্ণাটকের মাইসুরুতে পথ চলা শুরু হল "ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স" বা "আই.বি.সি.এ"-এর। বিগ ক্যাট শ্রেণিভুক্ত জীবের মধ্যে রয়েছে - বাঘ,সিংহ,লেপার্ড,স্নো-লেপার্ড,চিতা, জাগুয়ার, এবং পুমা। তুষার অঞ্চল হোক কিংবা উপকূলীয় বনভূমি৩ বিভিন্ন অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র ও খাদ্যশৃঙ্খলে বিগ ক্যাট পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা অপরিসীম।

তবে বিগত কয়েক দশক ধরে এই সমস্ত জীবেরা যে অস্তিত্ব রক্ষার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে তা নিবারণ করতেই এই আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়। প্রাথমিকভাবে বিগ ক্যাটের আবাসস্থল এমন ৯৭টি দেশ এই সংগঠনের সাথে যুক্ত। আই.বি.সি.এ-তে ভারত আগামী ৫ বছরের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন ডলার অর্থ বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিগক্যাট সংক্রান্ত গবেষণা,তথ্য আদান-প্রদান, ইকো ট্যুরিজম, সংরক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি স্থির করার ক্ষেত্রে এটি সত্যিই যুগান্তকারী এক পদক্ষেপ।

তবে, শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগ এত বড় দেশের বন্যপ্রাণকে সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত নয়। দরকার জনগণের সচেতন অংশীদারিত্ব। প্রাচীনকাল থেকেই পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে রয়েছে।এর সাথে যুক্ত হয়ে আছে নানা ধর্মীয় অনুষঙ্গ ও লোকাচার।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, বিশ্বায়িত বিশ্বব্যবস্থায় বদলে গেছে মানুষ ও জীবজগতের পারস্পরিক সম্পর্কের সমীকরণ।বাঘের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। চোরাশিকার, বনভূমির সংকোচন, জলবায়ুগত পরিবর্তন,খাদ্যশৃঙ্খলে ভাঙন এই সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে।'

মহাভারত-এর সেই শ্লোকটি আজও প্রাসঙ্গিক, যেখানে বলা হয়েছে "নরিবনো বধ্যতে ব্যাঘ্রো নরিব্যাঘ্রং ছদ্রিয়তে বনম্।" অর্থাৎ, বন ছাড়া বাঘ বিপদগ্রস্ত আর বাঘ ছাড়া বন ধ্বংসপ্রাপ্ত। তাই, মানুষ ও প্রকৃতির সংঘাত নয় সমন্বয়ের সংকল্প নিয়েই বেঁচে থাকুক বন্যপ্রাণ।

ট্রেনি-টিচার
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ,হুগলী
myselfalokab@gmail.com

মহাকাশে ফসল

দেবব্রত সুর

আমরা জানি যে নাসা দু'দশকের মধ্যে মঙ্গলে ছ'জন নভোচারীর একটি দল পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু সেই তিন বছরের অভিযানে তাঁরা কী খাবেন, সেটাই সবচেয়ে জটিল প্রশ্নগুলির মধ্যে অন্যতম।

এটা শুধু স্বাদ বা ক্যালোরির উৎসের বিষয় নয়; খাদ্যের সামগ্রিক গঠন, সতেজতা ও আরও অন্যান্য বিষয় আমাদের সুস্থতা বজায় রাখতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। কেবল টিকে থাকাই লক্ষ্য নয়। বর্তমানের সংরক্ষিত খাদ্য ব্যবস্থা মঙ্গল অভিযানের জন্য সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত।

এই অভিযানে ছ'জনের দলের জন্য আনুমানিক ১০,০০০ কেজি খাদ্যের প্রয়োজন হবে। নাসা একটি মহাকাশযানকে প্যাকেটবন্দি খাদ্য দ্বারা পূর্ণ ক'রে লাল গ্রহে আগে থেকেই অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ করতে পারে; তবে তার দ্বারা ওই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হবে না।

বহু ভিটামিন ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলি কয়েক মাসের মধ্যেই ভেঙ্গে যায়, তাই সেগুলি তার মধ্যেই সংশ্লেষিত হওয়ার প্রয়োজন পড়বে।

নভোচারীদের মহাকাশযানের বাগানে অন্ধকারে, সূর্যালোকের পরিবর্তে কৃত্রিম পুষ্টির দ্বারা উদ্ভিদ চাষ ক'রে নিজেদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে হবে।

মাটিতে প্রোথিত বীজের অঙ্কুরোদগম যে পদ্ধতিতে হয়, এক্ষেত্রেও সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। সৌর প্যানেল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ নভোচারীদের শরীর থেকে নির্গত তরল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে সরল, শক্তিসমৃদ্ধ হাইড্রোকার্বনে (বিশেষত অ্যাসিটেট) রূপান্তরিত করতে পারে, যা জিনগতভাবে পরিবর্তিত উদ্ভিদগুলি নিজেদের বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পারে; এমনকি মহাকাশের অন্ধকারে বা মঙ্গল গ্রহের আবছা আলোতেও, যেখানে পৃথিবীর তুলনায় অর্ধেকেরও কম সূর্যালোক পৌঁছায়,

সেখানেও তা সম্ভব।

আমেরিকার ইউ.সি. রিভারসাইডের বিজ্ঞানীদের একটি দল ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছেন যে, পরিবর্তিত উদ্ভিদগুলি আলোবিহীন পরিবেশে, এমনকি বিনা যত্নেও বেঁচে থাকতে পারে। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, ২ কিউবিক মিটার রাসায়নিক চুল্লিতে উত্থিত অ্যাসিটেট-ভক্ষক মাশরুমগুলি প্রতিদিন প্রায় ৮.৫ কেজি খাদ্য সরবরাহ করতে পারে, যা একটি সুদীর্ঘ মহাকাশ অভিযানে ছ'জন নভোচারীর কোনো দলের জন্য আবশ্যক খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি প্রয়োজন মেটাতে পারবে।।

যদি তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সফল হন, তবে আমরা জমি ও প্রচুর সূর্যালোক ছাড়াই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরণের শস্য উৎপাদনের কথা ভাবতে পারব।

এমনকি, দক্ষিণ মেরুতে, যেখানে কৃষিকাজ অসম্ভব, সেখানেও তখন তা সম্ভব হবে।

সদস্য,
ইসনা
sur_debu@hotmail.com

বিজ্ঞান কৌতুকী

তুহিন সাজ্জাদ সেখ

সকাল বেলায় বুলু ওর মামার সাথে পড়তে বসে পদার্থের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেই, বুলু ওর মামাকে জিজ্ঞাসা করলো, "মামা তাহলে তো বিজ্ঞানীরা এই পরমাণুদের কখনও বিশ্বাস করেন না নিশ্চয়ই..." মামা একটু অবাক হয়ে, বললেন, কেন মামনি---
বুলু বলে উঠলো, ওরা তো যখন তখন সব কিছু তৈরী করতে পারে, ওদের উপর ভরসা নাই! মামা একটু মুচকি হেসে নিজের বোকামি ঢাকে ঢাকার চেষ্টা করলেন।

মামা এবার বুলুকে একটু ঘাবড়ে দিতে জিজ্ঞেস্ করে বসলেন, এবার বলতো মামনি, ছত্রাক তৈরি হতে কতবড় রুম লাগবে? বুলু তো খুব চালাক, মুহূর্তেই মামাকে চমকে দিয়ে বললো, ও ছত্রাক! মানে মাশরুম! মামা এবার সত্যিই অবাক!

মামা মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এই জন্যই বোধহয় একজন ফিজিক্সের টিচার ও একজন বায়োলজি টিচারের মধ্যে ব্রেকআপ হয়ে যায়! কেননা এদের মধ্যে কোন কেমিস্ট্রি নেই ----

কিশলয়ের আঙিনায়

জাহ্নবী দত্ত
ক্লাস- প্রি ১
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন শিক্ষা মন্দির

সৌজন্য ব্যানার্জী
প্রথম শ্রেণী
গড়িয়া বিদ্যাভবন

মৌহিত বিশ্বাস
প্রথম শ্রেণী
রামমোহন মিশন স্কুল

শ্রীহান বিশ্বাস
চতুর্থ শ্রেণী
রামমোহন মিশন স্কুল

টল ঝাল মিষ্টি

কোনটা কেমন স্বাদ চাও যদি জানতে
জিভের ই আসল কাজ হুবে সেটা মানতে
অসংখ্য স্বাদ কুড়ি জিভটা রয়েছে জুড়ে
কেউ আগে, কেউ মাঝে কেউ আছে দুধারে
চার রকমের স্বাদ আছে সেটা জান তা!
মিষ্টি ও তেতো স্বাদ, টক আর নোনতা
ঝাল কোনো স্বাদ নয়, হলে পড়ে তপ্ত
স্বাদকুঁড়ি বলে দেয় ঝালটা জবর তো
ঠিক মত স্বাদবোধ চাও যদি জাগাতে
ঘ্রাণেন্দ্রিয়টিকেও হবে কাজে লাগাতে।।

হাসি হাসি গন্ধ

লালগানে নীলসুর হাসি হাসি গন্ধ
কথা কটি সুকুমার বলেননি মন্দ
হাসি হাসি গন্ধটা আজগুবী মোটে নয়
জেনে রেখো আছে গ্যাস
শুঁকলেই হাসি পায়
এন টু ও নাম তার
বলে রসায়নবিৎ
বেশী শুঁকে ফেললে
হারাবেই সম্বিৎ

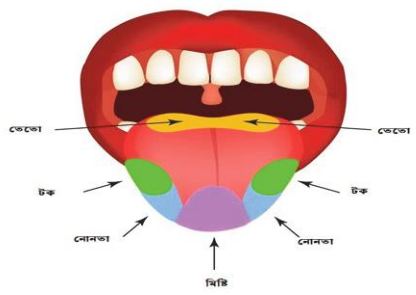

সুমিত্রা চৌধুরী
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলকাতা

জেবিএনএসটিএস
রাজ্যস্তরে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড

তন্ময় পাল

পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞানে শিক্ষার পটভুমিতে জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ একটি উজ্জ্বল নাম। রাজ্যের স্কুল পড়ুয়াদের জন্য এক অভিনব উদ্যোগ - বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এবং জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ (JBNSTS)- এর যৌথ উদ্যোগে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন প্রতিশ্রুতি।

এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন তথা উন্নতি ঘটানো। ২০২৩ সালে এটি দ্বিতীয় বার সম্পন্ন হতে চলেছে । প্রসঙ্গত, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এর প্রচলন থাকলেও, রাজ্যে এতদিন এই ধরণের উদ্যোগ ছিল না । গতবছর, অতিমারীর প্রকোপের পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম সায়েন্স অলিম্পিয়াড ছিল একটি নতুন মাইলফলক । এই পরীক্ষায় কৃতি দুইশত জন (২০০) ছাত্রছাত্রী নিয়ে সদ্য হয়ে গেল একটি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কর্মশালা। বর্তমানে যারা নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী, পশ্চিমবঙ্গে যেকোনো সরকারি তথা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পাঠরত, তাদের মধ্যে থেকে প্রথম পাঁচজন যোগ দিতে পারবে এই অলিম্পিয়াড পরীক্ষায়; আর সেইজন্য নাম পাঠিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা। রাজ্যের স্কুলস্তরের ভৌত বিজ্ঞান, গনিত ও জীবনবিজ্ঞানের (অষ্টম শ্রেণীর) সিলেবাসের উপর পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে। জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ কৃত বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড এর বিভিন্ন ধাপ তথা স্তর গুলি এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক।

প্রথমে রাজ্যজুড়ে ব্লকস্তরে প্রথম ধাপের পরীক্ষাটি নেওয়া হবে। এই পর্যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি ব্লকে একই দিনে অলিম্পিয়াডের প্রথম ধাপের পরীক্ষাটি ৭ মে ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম স্তর থেকে সফল ১০% ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পরীক্ষার দ্বিতীয় ক্রমটি অনুষ্ঠিত হবে যা হবে জেলা স্তরের পরীক্ষা। বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড-এর অন্তিম সোপানটি রাজ্যস্তরের পরীক্ষা যা জেলা স্তর থেকে সফল ২০% ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

গোটা রাজ্য থেকে নবম শ্রেণীর সেরা ১০০ জন পড়ুয়াদের মেধা বৃত্তি প্রদান করা হবে। জেলা ও রাজ্য স্তরের পরীক্ষা (দ্বিতীয় ও শেষ) গোটা রাজ্যে দুই পর্যায়ে একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে যা প্রতিষ্ঠানের তরফে পরে ঘোষণা করা হবে। নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের সারাবছর প্রতিষ্ঠানের তরফে বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে - কর্মশালা, আলোচনাসভা ইত্যাদির মাধ্যমে। একদিকে যেমন পড়ুয়াদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি অনুসন্ধিৎসা, আগ্রহ, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের নানাবিধ বিষয়ের উপর আগ্রহ তৈরী করা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে, অন্যদিকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের সায়েন্সে অলিম্পিয়াড গুলিতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ করার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

এই বছর জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড এর প্রথম স্তরের পরীক্ষায় সমগ্র রাজ্য থেকে ৩৫,১৭৬ পরীক্ষার্থী আবেদন করেছে। পরীক্ষার আগামী স্তরগুলোর বিষয়ে নিয়মাবলী তথা নির্দেশাবলী প্রতিষ্ঠানের তরফে ওয়েবসাইটে এ সকল ছাত্র ছাত্রী দের সুবিধার্থে নির্দিষ্ট সময় যথাযথ ভাবে দেওয়া হবে ।

ছাত্র,
ইসনা
paultanmoy.08@gmail.com

মিতা আন্টির ক্লাসে
স্টিক পাপেট

সীমা মুখোপাধ্যায়

পাপেট বললেই মনটা কেমন চনমন করে ওঠে ।ছোটদের মন জয় করতে পাপেটের জুড়ি মেলা ভার । শুধু ছোটরা কেন পাপেট যখন নড়াচড়া করে বা কথা বলে বড়রাও মন দিয়ে শোনে। মিতা আন্টি অনেক সময় ক্লাস শুরুর আগে পাপেট দেখিয়ে তারপর ক্লাস নেন। পড়ুয়ারা অবাক চোখে মন দিয়ে মিতা আন্টির ক্লাস করে। সেদিন আন্টি "বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন" নিয়ে ক্লাস নিলেন। তার আগে আন্টির ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়ল বেশ কয়েকটা পাপেট। কি কান্ড তার মধ্যে মশা পাপেটও ছিল। পাপেটগুলো দেখিয়ে একটা মজার গল্প বললেন, আর বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন-এর উপরে ক্লাসটা নিলেন। ক্লাস শেষে অনেকে পাপেটগুলো দেখতে চাইলো। আন্টি মশা পাপেটগুলোকে দেখিয়ে বললেন 'এগুলোকে বলে স্টিক পাপেট বা কাঠি পাপেট। তোমরা যদি চাও ছুটির পরে এসো তোমাদের শিখিয়ে দেবো কি করে বানাতে হয় এই পাপেট।'

সকলেই রাজী। সেদিন ছুটির পরে কেউ আর খেলতে ছুটলো না। সকলের আন্টির কাছে হাজির কিভাবে বানাতে হয় স্টিক পাপেট শিখতে। স্টিক পাপেট কিভাবে বানাতে হয় এবং যে গল্পটা সেদিন দেখিয়েছিলেন সেটা নীচে দেয়া হল।

স্টিক পাপেট তৈরির কায়দা

কয়েকটি স্টিক পাপেট

মশাদের আড্ডায়

(দুই মশা নিজেদের মনে কথা বলছে)

মশা এক --- শুনেছো আমাদের মেরে ফেলতে মানুষগুলো সব কিরকম ষড়যন্ত্র শুরু করেছে?
মশা দুই---- --- হ্যাঁ হ্যাঁ খুব জানি কর্পোরেশন/মিউনিসিপালিটির লোকেরা মশা মারার তেল আর টর্চ নিয়ে চিরুনি তল্লাশি করছে আমাদের মেরে ফেলতে।
মশা এক----আরে সেটা তো ওদের রুটিন ওয়ার্ক। আগে তো ওরা ডিডিটি ছড়িয়ে আমাদের ঝাড়ে নির্বংশ করেছে । একজন বিজ্ঞানী তো ডিডিটি আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কারই পেয়ে গেলেন।
মশা দুই------হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাপারটা আমি জানি। তবে আমরাও কি কম যাই? যত আমাদের উপর ডিডিটি ছড়ানো হচ্ছে আমরাও ওই বিষ সহ্য করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছি।
মশা এক------ বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারটাকে কি বলে জানো?
মশা দুই ------ না। জানি না।
মশা এক------ ওরা এই ব্যাপারটাকে বলে " বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন " ।
মশা দুই------- তার মানে?
মশা এক ----- কোন এক বিজ্ঞানীদের সভাতেই ব্যাপারটা শুনেছিলাম কীটনাশক ডিডিটি সহজে ভাঙে না। বছরের পর বছর একইভাবে থেকে যায়। আর সুযোগ পেলেই গাছপালা পোকামাকড়ের শরীরের চর্বির মধ্যে জমতে থাকে।
মশা দুই------ তাতে কি হয়েছে?
মশা এক------ আরে বুঝলে না ডিডিটি ঘাস বা জলে শ্যাওলার দেহে জমে ।এবার সেই ঘাস গরু খেলো বা সেই শ্যাওলা মাছ খেলো। এবার ঘাস থেকে ফড়িং , ব্যাং বা পাখির শরীরে ঢুকে নানান বিপত্তি ঘটায় ওই ডিডিটি। পাখিদের তো ডিমের খোলা পটাপট ভেঙে যায় । এদিকে জলে ছোট মাছ থেকে বড় মাছ হয়ে চলে যায় পশুপাখির শরীরে । মানুষও বাদ যায় না। সেখানে গিয়ে ঘটায় নানান বিপত্তি।
মশা ২----- মানুষেরা তাহলে আমাদের ক্ষতি করতে গিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনছে ?
মশা এক------ঠিকই বলেছ তবে বিজ্ঞানীরা তো বসে থাকে না আবার নতুন কিছু প্যাঁচ শুরু করেছে।
মশা ২----কিরকম কিরকম?
মশা এক-- সেদিন এক বিজ্ঞানের আড্ডায় গিয়ে শুনলাম ওরা পুরুষ মশাদের তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে স্নান করাচ্ছে।
মশা ২------তাতে কি হবে?
মশা এক --- আরে তাতে মশার বংশ নির্বংশ হবে। মিলনের পর স্ত্রী মশাদের ডিম ফুটে বাচ্চা হবে না।
মশা দুই ----- ও বাবা এতো আরেক বিপদ।
মশা এক ----- দাঁড়াও দাঁড়াও ব্যাপারটা অত সোজা নয়।

(ইতিমধ্যে মশারা খক খক করে কাশতে শুরু করলো)

মশা দুই----আরে আরে নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে । চলো চলো কেটে পড়ি।
মশা এক --- হ্যাঁ হ্যাঁ চলো চলো পালাই।

(এক পৌর কর্মীর প্রবেশ)

পৌর কর্মী---- বন্ধুগণ আপনাদের ঘরের আশেপাশে কোথাও জল জমতে দেবেন না । জমা জলে মশা ডিম পাড়ে। তাই চায়ের ভাঁড়, মিষ্টির হাড়ি, আইসক্রিমের কাপ ,পলিব্যাগ যেখানে সেখানে ফেলে রাখবেন না সব সময় মশারি টাঙিয়ে ঘুমাবেন। ডেঙ্গুর মশা দিনের বেলাতেও কামড়ায়। মশার কামড় থেকে বাঁচতে হাত পা ঢাকা জামা পরুন। আসুন মশার হাত থেকে রেহাই পেতে আমাদের চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি।

দুইজন পোস্টার নিয়ে গান করতে করতে ঢুকবে------
শোনো শোনো শোনো শোনো বন্ধুগণ
চায়ের ভাঁড়, দইয়ের হাড়ি, প্লাস্টিকের কাপ কাড়িকাড়ি,
ভরছে জলে বৃষ্টি হলে বাড়ছে মশাদের ঘরবাড়ি।
মশাদের তাড়াতে তাই জমা জল দূর করা চাই।
মশাদের তাড়াতে তাই জমা জল দূর করা চাই।

সদস্য,
ইসনা
sima.ekdalia@gmail.com

একটি হারিয়ে যাওয়া পত্রিকা

অরূপ মিত্র

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকার নাম কি? হঠাৎ যদি এরকম কোনও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে যেকোনো ওয়াকিবহাল ব্যক্তি সহজেই উত্তরটা দিতে পারবেন; সংবাদ প্রভাকর। প্রশ্নটিকে আরও একটু জটিল করে যদি জানতে চাওয়া হয়; প্রথম বিজ্ঞান পত্রিকা? তাও হয়তো কেউ কেউ বলে দেবেন, বিজ্ঞানকৌমুদী। কিন্তু যদি বলা হয় বাংলা ভাষার প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং পত্রিকা কি? এরকম কুটিল প্রশ্নের কিন্তু চটজলদি জবাব দেওয়া দুস্কর। এরকম যেকোনোও প্রশ্নের ক্রম কাঠিন্যের স্তর পেরতে গেলে সবার আগে যেটা প্রয়োজন সেটি হল বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা। তবে যদি সেই ধারনার উপাদানটিই যদি হারিয়ে যায়, তাহলে কি আমরা ভুলে যাবো আমাদের ইতিহাসকে? আজকে সেরকমই একটি পত্রিকার কথা বলবো, যা পুরোপুরি হারিয়ে না গেলেও আমরা তাকে ভুলে যেতে বসেছি।

ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলায় আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার বিকাশ ঘটেছিল শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হাত ধরে। তবে, এরও আগে এই কলেজটি ছিল প্রথমে রাইটার্স বিল্ডিং ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের সাথে যুক্ত। যাইহোক ১৮৮০-র শুরুতে কলেজটির শিবপুরে স্থানান্তরের পর ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ক্ষেত্রে যে জোয়ার আসে, তার স্পষ্ট প্রভাব পড়তে থাকে বাংলার সমাজের উপর। যদিও সেই শতকের শুরু থেকেই এই অঞ্চলে নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবির্ভাব এখানকার মানুষের চিন্তা ও কল্পনার জগতে যে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিলো, তার বেশ কিছু উদাহরন পাওয়া যায়। বিদেশী যন্ত্রের অনুকরন ও নতুন উদ্ভাবনের পাশাপাশি বেশ কিছু প্রযুক্তিকেন্দ্রিক গ্রন্থও এযুগে লেখা শুরু হয়। কিন্তু উনিশ শতকীয় বাংলার পত্রিকা সাহিত্যের বিকাশের ধারার সাথে তাল মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ইঞ্জিনিয়ারিং পত্রিকার আবির্ভাব হতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। সেই অভাব পূরণ হয় নতুন শতকের গোড়ায় শিবপুর কলেজ পত্রিকার প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

১৯০২ সালে মূলত একদল কলেজের ছাত্রদের উদ্যোগেই শিবপুর কলেজ পত্রিকার পথচলা শুরু হয়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন কলেজেরই এক ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং ব্যবস্থাপক ভোলানাথ শীল। প্রথমদিকে এটিকে হাতে লিখে প্রকাশ করা হলেও, পরে তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল হেটেন সাহেবের উৎসাহে কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীটের মনিকা প্রেস থেকে ছাপার অক্ষরে বের হতে থাকে। এজন্য ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশনের তরফ থেকে একশত টাকার একটি অনুদানও তারা লাভ করে। নিজেদের কলেজের ইতিহাসকে তুলে ধরার পাশাপাশি এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশেষ করে বলা হয়, "আমাদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার কোন উপায় না থাকাতে এবং ইংরাজীই এই শিক্ষার প্রধান অবলম্বন বলিয়া কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবিষয়ে অধিকার আছে। অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের এবিষয়ে জ্ঞানলাভের কোন উপায় থাকে না। যাহাদের দ্বারা দেশের শিল্পাদি কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে তাহারাত সকলেই অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত। সবল বাঙ্গালাভাষায় বিজ্ঞান শিল্পাদি বিষয় সাধারণ জনসমীপে বিস্তার করাই আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য।"

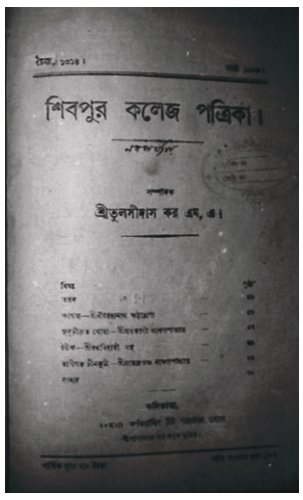

কি কি ধরনের প্রবন্ধ এখানে প্রকাশিত হত? মূলত একটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হওয়ার দরুন ইটকাঠ-ইমারত-নর্দমা নির্মাণের মতো বিষয়গুলিই এখানে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। তার পাশাপাশি স্বদেশীয় কামারেরা কিভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির কাজে লাগাতে পারে, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির কোনটির কিরূপ ব্যবহার, উচ্চফলনশীল বীজের পাশাপাশি বিদ্যুতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ কিংবা লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম শিল্পের বাজারের হাল-হকিকত এতে স্থান পেয়েছিল। বাঙালি ছাত্রসমাজ যে শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে অনুদ্যোগী এবং একান্ত দায়ে পড়েই যে সহজে চাকরির লোভে প্রযুক্তি শিক্ষার দিকে আসতে শুরু করেছে - সেকথা প্রকারান্তরে মেনে নিয়েও তারা আশা করতেন যে, "এখানকার ছাত্ররা সে ধারনা শীঘ্রই দূরীভূত করতে সমর্থ হইবে।"

এই বক্তব্যের ঠিক কয়েক বছর পড়েই স্বদেশী যুগে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রেক্ষিতে বাঙালি উদ্যোগপতিদের যে সংখ্যাতাত্ত্বিক জোয়ার আসে, তাতে কিছুটা হলেও যে আশা বাস্তবের মুখ দেখেছিল তা বলাই যায়। একইসাথে নতুন শতকের সাথে এসে উপস্থিত হয় বেশ কিছু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্রিক পত্রিকা। তবে, এসবের ভিড়ে হারিয়ে যায় শিবপুর কলেজ পত্রিকাটির নাম। বাংলার অধিকাংশ সাময়িক পত্রিকার মতোই প্রথম প্রকাশের মাত্র কয়েক বছর পড়েই এটি বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রদের যে উদ্যোগী গোষ্ঠীর হাতধরে এইরকমের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী পত্রিকার জন্ম তাদের কলেজ ত্যাগের সাথে সাথেই সেটিরও অপমৃত্যু ঘটে। দুঃখের কথা নিজের অতীত বিস্মৃতির কারনে কুখ্যাত বাঙালি সমাজ আর তাদের কথা মনে রাখেনি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরীর কোনও এক কোণে পরে থাকা এই পত্রিকার শেষ কিছু কপি যেন শোনাতে চায় তাদের সেই মর্মবেদনার কথা।

পিএইচ.ডি. গবেষক,
ইতিহাস বিভাগ,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
arupmitra311@gmail.com

আকাশ, মাটি ও সৌমেন মুখার্জী

সুরাজ পাল

যে আকাশের নীচে আমরা জন্মেছি, বড় হয়েছি সেই আকাশ সম্পর্কে আমাদের অপার কৌতূহল থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি প্রশ্ন করি, আপনি কি আকাশ চেনেন? আকাশের রঙ-বেরঙের তারাদের দেখে চিনতে পারেন? অবাক লাগলেও আমরা বেশিরভাগ মানুষই আকাশকে সেভাবে জানি না বা বুঝি না। অথচ আমাদের মধ্যেই বেশ কিছু মানুষ রয়েছেন যাঁরা পরম মমতায় কাছের আত্মীয়টিকে পরিচিত করানোর অবিরত চেষ্টা করে গেছেন।

এঁদেরই একজন সৌমেন মুখার্জি, যিনি একজন শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানী। টেলিস্কোপ বিশেষজ্ঞ। তারায় তারায় ছেয়ে থাকা রাতের আকাশটাকে চেনা এবং জানার আগ্রহ ছিল তরুণ বয়স থেকেই। সেই সুবাদেই একক প্রচেষ্টায় আকাশ চেনা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার শুরু। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ভর্তি হলেও, ছাত্র আন্দোলনের জোয়ারে তা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। নকশাল আমলে চার বছর জেলও খেটেছেন। ছাড়া পেয়ে বেছে নিয়েছেন শিক্ষকতার জীবন। বিজ্ঞান শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন সুনাম।

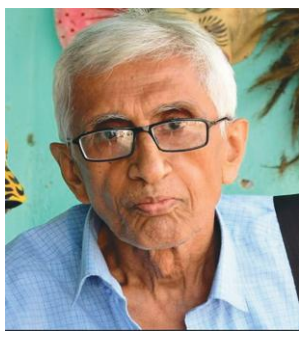

১৯৮৬ সালে হ্যালির ধূমকেতু আগমনের সময় সারা পৃথিবী জুড়েই আলোড়ন উঠেছিল, যার টেউ এসে পড়েছিল ঢাকুরিয়াতেও। এই সময়েই তিনি আকাশ দেখানোর জনপ্রিয় সংগঠন স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশনের (কলকাতা) সঙ্গে পরিচিত হন এবং সেখানে যোগদান করেন। প্রায় পাঁচ দশক ধরে এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন। সংগঠনের সহ-সভাপতি হিসেবেও রেখেছেন তাঁর কৃতিত্ব।

১৯৮৬-৮৭, এই এক বছরের যৌথ প্রচেষ্টায় তাঁর নেতৃত্বেই স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন একটি ৯ ইঞ্চি টেলিস্কোপ তৈরি করতে সমর্থ হয়। এরপর একে একে আরও বেশ কিছু টেলিস্কোপ তিনি তৈরি করেন, যেগুলি জনমানসে জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রচারে খুব সহায়ক হয়েছিল।

ছাত্রছাত্রীদের হাতেকলমে টেলিস্কোপ বানানোও শিখিয়েছেন। ১৯৮৭ সালে ব্যাঙ্গালোরে IIA-এর অধিকর্তা জ্যোতির্বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের পরামর্শে তিনি ভেরিয়েবল স্টারস সম্পর্কে গবেষণামূলক পর্যবেক্ষণের কাজে যোগ দেন। ১৯৮৮ সাল থেকে AAVSO-এর নিয়মিত ও স্বীকৃত পর্যবেক্ষক রূপে, AAVSO-তে পরিবর্তনশীল তারা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে এসেছেন। সেই সাথে সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদেরও পরিবর্তনশীল তারা সম্পর্কে নিয়মিত পর্যবেক্ষণে অনুপ্রানিত করছেন।

গ্রহ-নক্ষত্র সংক্রান্ত কুসংস্কার দূরীকরণ, আকাশ পর্যবেক্ষণ ও বিশেষ বিশেষ মহাজাগতিক ঘটনা উপলক্ষে তিনি বহু সেমিনার ও কর্মশালায় বক্তৃতা করেছেন এবং পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন। তিনি বলতেন, "মানুষকে ভুল শেখাবেন না। যা বলবেন সবটা জেনে বলবেন। আপনি কতটা জানেন সেটা বড় কথা নয়, আপনার সেই জানা বিষয় বা সেই জ্ঞান মানুষ কতটা বুঝল সেটাই বড় কথা"।

সৌমেন বাবু ছিলেন নম্রভাষী, বিনয়ী অথচ স্পষ্ট বক্তা। সদা কর্মচঞ্চল মানুষটি বয়সের ভারকে উপেক্ষা করতে শিখেছিলেন। গড়গড় করে শুকনো তথ্য পরিবেশন তার বলার ধরন ছিল না। কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামার মধ্যে দিয়ে গল্পচ্ছলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবার মর্মে কথাগুলো গেঁথে দিতেন, তাদের ভাবতে বাধ্য করতেন। যুক্তি দিয়ে সহজ ভাষায় বোঝাতেন। লিখেওছেন প্রাথমিক জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার বই ক্যালেন্ডার কথা (২০০৬), আকাশ দেখার হাতেখড়ি: খালিচোখে আর বাইনোকুলারে (২০০৭), আকাশ দেখা (২০১২)। এই বইগুলি আগামীতেও বহু মানুষকে আকাশচর্চায় উৎসাহ জোগাবে।

গত ১৭ মার্চ (২০২৩) রাত ৮টা ১২মিনিটে তাঁর জীবনাবসান হয়। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। বাংলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চাকে ছড়িয়ে দিতে নিবেদিতপ্রাণ এই মানুষটিকে আকাশপ্রেমী মানুষেরা বহুদিন মনে রাখবে।

প্রোজেক্ট ফেলো
ইতিহাস বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
surajpal5858@gmail.com

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থা

কাল থেকে আজ

সাগ্নিক চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের প্রসারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। সেরকমই একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ইম্পেরিয়াল ইন্সটিউট অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, যা বর্তমানে ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সটিউট নামে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠান ভারতের কৃষির উন্নতিকল্পে শতাধিক বছর ধরে নিজেদের গবেষণার স্বাক্ষর রেখে চলেছে, আজ আমরা তার ইতিহাসের সাথে সংক্ষিপ্ত পরিসরে পরিচিত হব।

ভারতে ঔপনিবেশিক সরকারের কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক ভাবনাচিন্তাকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্বের সময়কাল সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রাকলগ্ন থেকে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ অবধি, দ্বিতীয় পর্ব ১৮২০ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত।

এসময় ঔপনিবেশিক সরকার সরাসরি কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে অংশগ্রহণ না করলেও এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির মত সংস্থাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল।

তৃতীয় পর্যায় ১৮৬৫ থেকে শুরু হচ্ছে। এই সময়পর্বকে আবার দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়, প্রথম

Imperial Agricultural Research Institute, Pusa, Bihar.

ভাগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র গড়ে ওঠে, প্রথমটি গড়ে উঠেছিল মাদ্রাজের সৈদাপেটে, পরবর্তীতে কানপুর, শিবপুর সহ বিভিন্ন স্থানে। এই উদ্যোগগুলি গ্রহণ করা হলেও তা ছিল উদ্যমহীন ও শিথিল, একারণে বিংশ শতকের প্রথম লগ্নে অর্থাৎ তৃতীয় পর্বের দ্বিতীয় ভাগে লর্ড কার্জন সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে একটি গবেষণামূলক কৃষিবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হন।

সেসময় ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন লোকহিতৈষী হেনরী ফিপস ভারতের গাছগাছালি ও অন্যান্য বিষয়ক গবেষণার জন্য এক লক্ষ ডলার দান করেছিলেন। এইচ আর রিসলে সহ অন্যরা এই অর্থ চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতে খরচে আগ্রহী হলেও তাদের অগ্রাহ্য করে কার্জন ঠিক করেন ওই অর্থ দিয়ে কৃষিবিদ্যার ওপরে গবেষণার জন্য একটি গবেষণাগার গড়ে উঠবে, যা হবে সেন্টার ফর ইকনমিক সায়েন্স।

একথা জানতে পেরে ফিপস আরো পঞ্চাশ হাজার ডলার দানের প্রতিশ্রুতি দান করেন, যার ফলশ্রুতিতে একই পরিকল্পনার অধীনে একটি কৃষিবিদ্যার কলেজ ও একটি পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অবশেষে বিহারের পুসাতে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ইম্পেরিয়াল ইন্সটিটিউট অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের কাজ পূর্ন উদ্যমে শুরু হয়। পুসাতে গবেষণাগারটি স্থাপনের পেছনে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যও কাজ করেছিল।

নীল ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা নিজেদের স্বার্থরক্ষায় সমস্তিপুরের কাছে অবস্থিত পুসা'য় কৃষি গবেষণাগার স্থাপনের জন্য চাপ দিয়েছিল, কারন উত্তর বিহারের নীল উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির কাছাকাছি এর অবস্থান ছিল। এমনকি এর ভিত্তিপ্রস্তরের সময় কার্জন স্বয়ং বলেছিলেন, এর উদ্দেশ্য হবে জার্মানের কৃত্রিম নীলকে পরাজিত করে কিভাবে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে স্বল্পমূল্যে নীল উৎপাদন করা যায় সেদিকে বিশেষ নজর রাখা। কারন ১৮৯৯-এ জার্মানিতে টিউটনিক সিন্থেসিস নীল আবিষ্কারের ফলে নীলকর সাহেবেরা আন্তর্জাতিক বাজারে চাপের সম্মুখীন হতে হচ্ছিলেন।

যাইহোক, পরবর্তীতে এই প্রতিষ্ঠান ভারতের কৃষি আবাদ সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষায় বিশেষ অবদান রেখেছিল, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে এর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় ইম্পেরিয়াল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট। ১৯৩৪এ বিহারে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের ফলে সিদ্ধান্ত হয় এই সংস্থা নতুন দিল্লীতে স্থানান্তর করা হবে। ফলত এর স্থান পরিবর্তিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ইম্পেরিয়াল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটে নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সটিউট (IARI), যা আজও এর প্রথম স্থাপন কেন্দ্র 'পুসা'র নাম স্মরণে রেখে পুসা নামে অধিক পরিচিত।

ইতিহাস বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
sagnik.chakraborty7@gmail.com

ক্যান্সারের চিকিৎসা

মস্তিষ্কে নয়া পথ দেখালেন সরিতা

মীনাক্ষী দে

সরিতা কৃষ্ণ নামে এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে মার্কিন বিজ্ঞানীদের একটি দল মস্তিষ্কের ক্যান্সারের চিকিৎসা পদ্ধতিতে যুগান্তকারী দিশার খোঁজ পেলেন।

এঁরা সকলে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সান ফ্রান্সিস্কো মেডিকেল সেন্টারের বিজ্ঞানী। তাদের আবিষ্কারের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে সায়েন্স জার্নাল নেচারে। কেরলের তিরুবনন্তপুরমের বাসিন্দা সরিতার নেতৃত্বাধীন গবেষক দলটির দাবি মস্তিষ্ক ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষগুলি সুস্থ কোষগুলোর সঙ্গে জুড়ে গিয়ে হাইপার একটিভ অর্থাৎ অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারপর সুস্থ কোষগুলি প্রবল গতিতে নষ্ট হতে শুরু করে এবং রোগী খুব অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান। সরিতার নেতৃত্বাধীন গবেষক দলটি জানিয়েছে যে এই গোটা প্রক্রিয়ায় তারা থ্রমবোসস্পন্ডিন - ১ নামে একটি প্রোটিনের ভূমিকা কথা জেনেছেন। এই বিজ্ঞানীদের দাবি যে গাবাপেন্টিন নামে বহুল পরিচিত একটি ওষুধের যথাযথ প্রয়োগের ফলে মস্তিষ্ক ক্যান্সার কোষগুলি সুস্থ কোষ গুলির হাইজ্যাক করার প্রক্রিয়াকে স্লথ করতে পারে।

জিও ব্লাস্টোমা নামে প্রাণঘাতী এক রোগের চিকিৎসাও সহজ হতে পারে। পরবর্তীকালে এই আবিষ্কার কে পাথেয় করে নতুন ওষুধ পত্র ও নিউরো মডুলেশন টেকনিক তৈরি করা যেতে পারে বলে গবেষকরা দাবি করেন।

প্রাক্তন অধ্যাপিকা,
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা
deminakshi1965@yahoo.com

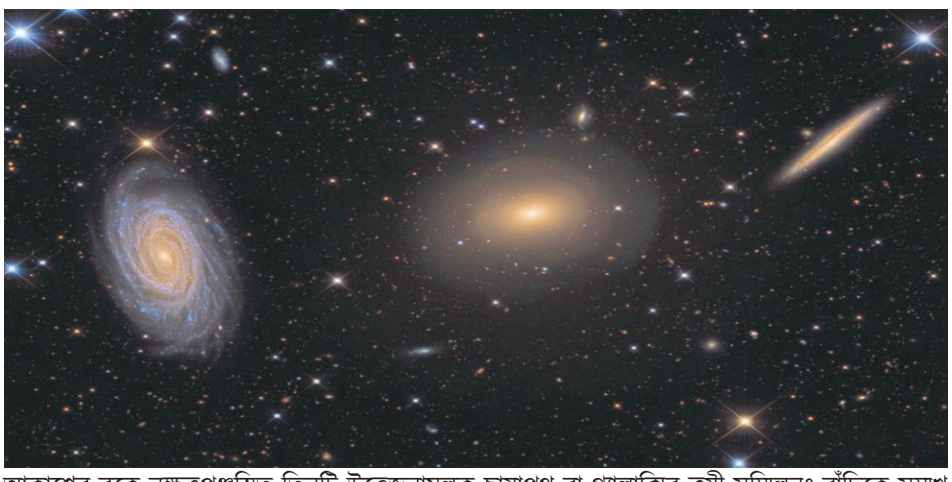

আকাশের বুকে নক্ষত্রপুঞ্জস্থিত তিনটি উত্তেজনামূলক ছায়াপথ বা গ্যালাক্সির ত্রয়ী সম্মিলনঃ বাঁদিকে সম্মুখ সর্পিল এনজিসি ৫৯৮৫, মধ্যখানে উপবৃত্তাকার এনজিসি ৫৯৮২ এবং ডানদিকে প্রান্তিক সর্পিল এনজিসি ৫৯৮১ গ্যালাক্সি।এদের একত্রে ড্রাকো গ্রুপও বলা হয়ে থাকে। তবে এই ধরনের ছায়াপথ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় সেইফার্ট গ্যালাক্সি নামেই পরিচিত। ১৯৪৩ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল কে. সেইফার্ট, কেন্দ্রস্থলে স্পষ্ট নির্গমন দিক বিশিষ্ট অদ্ভুত আলোকচ্ছটা সমন্বিত এই বিশেষ ধরনের গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের নামকরণ করেন "সেইফার্ট গ্যালাক্সি"। তুহিন সাজ্জাদ সেখ

বর্তমান যুগে বহু মানুষ বৃক্কে বারংবার পাথর জমে যাওয়া এবং তা থেকে সৃষ্ট মূত্র উৎপাদন ও নিঃসরণ জনিত ব্যাথা বেদনা ও আরও বিভিন্ন আনুষঙ্গিক রোগের সম্মুখীন হয়। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় অস্ত্রোপ্রচারের মাধ্যমে বৃক্ক বা কিডনি থেকে পাথর বার করে দেওয়ার পরেও, আবার পাথর জমতে শুরু করে।

আমরা জানি যে, বৃক্কের গঠন গত ও কার্য গত একক হলো নেফ্রন। নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত সম্প্রতি একটি গবেষণা অনুসারে প্রতিটি বৃক্ক দশ লক্ষ নেফ্রন দিয়ে গঠিত। অর্থাৎ আমাদের শরীরে দুটি বৃক্ক মিলে নেফ্রনের মোট সংখ্যা হওয়া উচিত কুড়ি লক্ষ। আমরা যখন মাতৃ জঠরে ভ্রূণ হিসেবে ৯ মাস বা ৩৬ সপ্তাহ থাকি, তখনই ২০ লক্ষ নেফ্রনের গঠন সম্পূর্ণ হয়। ঐ গবেষণা পত্র অনুসারে আমাদের জন্মের পরে আর কোনো নতুন নেফ্রনের সৃষ্টি হয়না।

কোনো শিশু যদি ৯ মাস বা ৩৬ সপ্তাহের পূর্বেই ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে তাঁর প্রতিটি বৃক্কে নেফ্রনের সংখ্যা ১০ লক্ষের কম হবে। গবেষণা দ্বারা এও প্রমাণ হয়েছে যে, যদি মাতৃ জঠরে ভ্রূণের পুষ্টির অভাব হয়, সেক্ষেত্রে ৯ মাস বা ৩৬ সপ্তাহ গর্ভাবস্থার পরেও যদি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলেও নেফ্রন সৃষ্টি বা বৃক্কের গঠনে জন্ম থেকেই সমস্যা তৈরী হতে পারে।

কারণ এক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত পুষ্টি থেকে প্রাপ্ত শক্তি শিশুর মস্তিষ্ক গঠনকে প্রাধান্য দেয়, বৃক্ক গঠন বা নেফ্রন সৃষ্টির তুলনায়। অর্থাৎ এই সকল ক্ষেত্রে একটি শিশু জন্ম থেকেই বৃক্ক জনিত শারীরিক সমস্যায় ভোগে এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে সমস্যা আরও বাড়তে থাকে এবং বৃক্কে পাথরও জমতে শুরু করে।

ঔষধ বা শারীরবিদ্যায় ২০২২ সালে নোবেল প্রাপ্ত বিজ্ঞানী সান্টে পাবো প্রমাণ করেছেন যে, আমরা বর্তমান মানুষ আজ থেকে ৪০,০০০ বছর পূর্বে পশ্চিম ও পূর্ব ইউরেশিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া নিয়েন্ডারথাল আদিম মানুষের এক থেকে দুই শতাংশ বংশানু বা জিন বহন করে চলেছি। এই বংশানুকে চিহ্নিত করা হয়েছে নিয়েন্ডারথাল বংশানু হিসাবে। আজকের দিনে দক্ষিন এশিয়া অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও আফগানিস্থানের ৫০ শতাংশ মানুষ এবং ইউরোপের ১৬ শতাংশ মানুষ দেহকোষে নিয়েন্ডারথাল বংশানু বহন করে চলেছে।

বিজ্ঞানী সান্টে পাবো তার গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, এই নিয়েন্ডারথাল বংশানু মহিলাদের প্রসবকালে ক্ষরিত হওয়া এক বিশেষ স্ত্রী হরমোন প্রোজেস্টরন এর গ্রাহক প্রোটিনকে নিয়ন্ত্রন করে।

বৃক্কের রোগে বংশানুর প্রভাব

সঞ্জিত কুমার সাহা

কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এই নিয়েন্ডারথাল বংশানু বহনকারী গর্ভবতী মহিলাদের অকাল প্রসবের সম্ভাবনা যেমন বেশী, তেমন মৃত শিশু প্রসবের সম্ভাবনা অনেক কম। অর্থাৎ বিলুপ্ত আদিম মানুষের নিয়েন্ডারথাল বংশানু বহনের জন্যই বর্তমান গর্ভবতী মহিলাদের জীবিত কিন্তু অপরিণত শিশু জন্ম দেওয়ার প্রবণতা বেশি।

আমরা আগেই দেখেছি পরিণত শিশুর জন্মের সাথে দুটি বৃক্ক মিলে সম্পূর্ণ ২০ লক্ষ নেফ্রন তৈরির সম্পর্ক আছে। তাহলে এটা প্রমাণিত যে, নিয়েন্ডারথাল বংশানু বহনের কারণে জন্ম নেওয়া অপরিণত শিশু শৈশব অবস্থা থেকেই বৃক্ক জনিত বিভিন্ন শারীরিক রোগভোগের সম্মুখীন হতে পারে। যেহেতু অপরিণত শিশুর বৃক্কে, গঠনগত ও কার্যগত একক নেফ্রনের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকছে এবং আগামী দিনে আর নতুন নেফ্রন তৈরির সম্ভাবনা নেই, সেই কারণে রক্তের পরিস্রুতকরণ, মূত্র উৎপাদন, শরীরের আবর্জনা ও অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় দূষিত তরল পদার্থের নিঃসরণ শৈশব থেকেই ব্যাহত হচ্ছে।

আদিম মানুষ থেকে বর্তমান মানুষে নিয়েন্ডারথাল বংশানু বহনের প্রতীকী চিত্র। ছবিঃ জিনোমিক্স এডুকেশন প্রোগ্রাম/ইউ.কে.

এই কারণে বয়স বাড়ার সাথে সাথে মূত্রে উৎপন্ন ক্যালসিয়াম অক্সালেট এবং ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ছে। এক্ষেত্রে বৃক্ক তার স্বাভাবিক কাজ হিসাবে ক্যালসিয়াম অক্সালেট ও ইউরিক অ্যাসিডকে সম্পূর্ণরূপে শরীর থেকে নিঃসরণে ব্যর্থ হচ্ছে এবং পরবর্তীকালে ঐসকল বর্জ্য পদার্থ জুড়ে গিয়ে বৃক্কে পাথররূপে সঞ্চিত হচ্ছে। এর ফলে নিয়েন্ডারথাল বংশানু বহনের কারণে জন্ম নেওয়া এবং বেড়ে ওঠা মানুষের মধ্যে বৃক্কে পাথর তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকছে। যেহেতু জন্মলগ্ন থেকেই বৃক্কের গঠন ও কাজ ব্যহত হয়েছে, তাই পরবর্তীকালে অস্ত্রোপ্রচারের মাধ্যমে বৃক্কজনিত পাথর শরীর থেকে বার করে দিলেও তা আবার তৈরি হচ্ছে এবং বৃক্কে জমতে শুরু করছে।

তবে ভবিষ্যতে যদি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা বংশানু প্রকৌশল বিদ্যার মাধ্যমে কোনোভাবে গর্ভাবস্থায় ক্ষরিত হওয়া প্রোজেস্টেরন হরমোনের গ্রাহক প্রোটিনকে নিয়েন্ডারথাল বংশানুর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা যায়, তাহলে অপরিণত শিশু প্রসবের প্রবণতা কমতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে মৃত শিশু প্রসবের প্রবণতার কথাও আমাদের ভাবতে হবে। এছাড়াও এই নিয়েন্ডারথাল বংশানু বহন করার ফলে আমাদের শরীরে বাতজ বেদনা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই নিয়েন্ডারথাল বংশানু বহনের কারণে আবার এইচ. আই. ভি. বা এইডস্ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম কিন্তু কোভিড বা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

বিজ্ঞানী সান্টে পাবো'র গবেষণা অনুসারে করোনা ভাইরাসের প্রভাব ছাড়াও বিগতদিনে কোভিডে মৃত অতিরিক্ত ১১ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ত্বরান্বিত বা প্রভাবিত হয়েছে এই নিয়েন্ডারথাল বংশানু বহনের ফলে। আমাদের টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগের সাথেও এই নিয়েন্ডারথাল বংশানু জড়িত। এই নিয়েন্ডারথাল বংশানুকে তাহলে দুই দিকে ধারালো বা দুই দিকে কাটে এমন তলোয়ার বলা যেতে পারে।

বিভাগীয় বন আধিকারিক,
অরণ্য ভবন,
পশ্চিমবঙ্গ
sanjitwbfs@gmail.com

ইসনায় পরিবেশ দিবস পালন

মালবিকা সেনগুপ্ত

গত ৫ ই জুন রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ ক্যাম্পাসে মেঘনাদ সাহা অডিটোরিয়ামে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হলো। সায়েন্স এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এবং ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশন যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

ক্যাম্পাসের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারি ড: অমিত রায়ের হাতে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা হয় । এরপর ইসনার সম্পাদক ড: অমিত কৃষ্ণ দের অতিথি বক্তাদের অভিবাদনের মধ্যে দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। অপর সম্পাদক প্রফেসর মানস চক্রবর্তী স্বাগত ভাষণ জানান। তিনি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও ড: মেঘনাদ সাহা কতৃক প্রতিষ্ঠিত ইসনা র ইতিহাস,কর্মকান্ড ও প্রকাশিত ম্যাগাজিন "সায়েন্স এন্ড কালচার" এবং ই - ম্যাগাজিন "সায়েন্টিফিকা কমুনিকা" ও "বিজ্ঞান কহন" সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। ড : শুভব্রত রায়চৌধুরী, সম্পাদক, সায়েন্স এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল[SAB] এবং বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মতামত রাখেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই বছরের পরিবেশ দিবসের মূল বিষয় ভাবনা হলো প্লাষ্টিক দূষণ রোধ। প্লাষ্টিক দূষণ নিয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন। এখনো যে পুরোপুরি প্লাষ্টিক ব্যবহার রোধ করা যাচ্ছে না তিনি সেই ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করেন। শরীরে এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়েও আলোচনা করেন।

পরবর্তী বক্তা ইসনার ভাইস প্রেসিডেন্ট, অধ্যাপক বাসব চৌধুরী, গ্রীন টেকনোলজি নিয়ে সুচিন্তিত মতামত দেন। তিনিও প্লাষ্টিক ব্যাগ, বোতল না ব্যবহার করতে অনুরোধ করেন। অবশেষে ইসনার কাউন্সিল মেম্বার শ্রী প্রশান্ত কুমার বসু পুরোনো কলকাতার গল্প সোসাইটি এর অতিথি বক্তাদের কাজ সম্পর্কে জানান।

এরপর ড : পারিজাত চক্রবর্তী, এই,SAB গ্রীন টেকনোলজি এর বিভিন্ন ব্যবহারিক দিক আলোচনা করেন। নানারকম অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সম্পর্কে আলোচনা করেন যেগুলির সমাজে ব্যবহারিক মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই যন্ত্রগুলি পরিবেশকে সুস্থ ও পরিষ্কার রাখার কাজে সাহায্য করবে। যন্ত্র গুলি দিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ, রাস্তা পরিষ্কার, রেল লাইন পরিষ্কার, আবাসন এর ক্যাম্পাস পরিষ্কার,দূষিত জল পরিষ্কার, অটোমেটিক আবর্জনা সেগ্রেগেটর ,যা তার ছাত্রদের দ্বারা নির্মিত ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কাজ খুবই যত্ন সহকারে ব্যাখ্যা করেন।গ্রীন কেমিস্ট্রি ও গ্রীন হাইড্রোজেন এর ব্যাপারেও অবহিত করেন।. পরিশেষে ড. জয়ন্ত সেন এবং শ্রীমতি স্বর্ণালী চট্টোপাধ্যায় "সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ" নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ ও মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন। সুন্দরবন অঞ্চলের ইতিহাস, ব্রিটিশ আমলের(১৮৩০ সাল) থেকে শুরু করে বর্তমান সময়কাল অবধি এই অঞ্চলের যথেচ্ছ গাছ কাটার ফলে এই টঘউঝঈঙ হেরিটেজ সাইটটিতে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা জানান। এখানকার জীববৈচিত্রের উপরে খুবই ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে।

এখানকার প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ এর পরিসংখ্যান ব্যাখ্যা করে ওঁরা এর ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরেন। পাশাপাশি মনুষ্য জাতির নানাবিধ কার্যকলাপ যথা ট্যুরিজম, চাষবাস, মাছচাষ প্রভৃতির ফলে দ্বীপগুলির প্রভূত ক্ষতি সাধন হচ্ছে। ওঁরা নয়াচর ও ঘোড়ামারা দ্বীপের বর্তমান করুণ পরিস্থিতির কথা জানান। এবং এই যথেচ্ছচারের ফলে বারবার আমফান, যশ, আয়লা জাতীয় ঝড় ও জলোচ্ছাসের পুনরাবৃত্তি হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। অবৈজ্ঞানিক ভাবে পুনর্নির্মাণ এর কুফল আলোচনা করেন।

ওঁরা ইকোট্যুরিজম, মানুষের সচেতনতা, ও এই অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষের সঠিক চিন্তাধারাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়ণ করা যেতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে কলকাতার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ এর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ টপিক নিয়ে তাৎক্ষণিক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। স্কুল বিভাগে বেথুনস্কুলের ছাত্রীরা ও কলেজ বিভাগে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ছাত্ররা ভালো ফল লাভ করেন।

স্কুল শিক্ষিকা এবং
ইসনা ছাত্রী
mlbk.sngpta@gmail.com

বিজ্ঞানকে জনমুখী করে তোলার কাজে ইসনা

শুভঙ্কর কুণ্ডু

১৫ জুন, ২০২৩ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার ক্যাম্পাসের এন. আর. সেন অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল ইন্ডিয়ান সাইন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন (Indian Science News Association) ও বিজ্ঞান প্রসার -এর পক্ষ থেকে ৩৬ তম বিজ্ঞান যোগাযোগ ও সংবাদ মাধ্যম অনুশীলন প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী কমলাষ্ঠানন্দ মহারাজ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক ও জনসংযোগ বিশেষজ্ঞ বিশ্বরূপ মুখার্জী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ রাজর্ষি মিত্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ডাঃ অতনু পাল, শুভেন্দু মণ্ডল, পথিক গুহ প্রশান্ত কুমার বসু সহ সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইসনার সম্পাদক ডঃ অমিত কৃষ্ণ দে।

বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে অতিথিদের বরণ করা হয় পুষ্প স্তবকের পরিবর্তে ছোট চারাগাছ দিয়ে, যা ছিল একটি অভিনব উদ্যোগ। স্বামী কমলাস্থানন্দ মহারাজ তাঁর বক্তব্যে নতুন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন "সহজভাবে বিজ্ঞানের চর্চা করা এবং তাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই যেন হয় এই কোর্স এবং ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য। জটিল করে ভাবতে গিয়ে আমরা খুব সরল বিষয়গুলিকেও জটিল করে তুলেছি"। বিশ্বরূপ মুখার্জী বলেছেন, "বিজ্ঞানকে সঠিকভাবে প্রচার ও প্রসারের জন্য এই ধরনের কোর্সের প্রয়োজন আছে"। ১৯৯৮ সালে নিজে এই কোর্সটি করে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন রাজর্ষি মিত্র। তিনি বলেছেন "এটিকে শুধু একটি তিন-চার মাসের কোর্স ভাবা ঠিক হবেনা। বিজ্ঞানের নানান বিষয়গুলিকে নিয়ে হাতে কলমে চর্চা করতে এবং সর্বোপরি কীভাবে কোনো প্রতিবেদন বা খবরের কাগজে লেখা লিখতে হয়, তা শেখানো হয় এই কোর্সটির মধ্যে দিয়ে"। অনুষ্ঠানে "তৃতীয় অধ্যাপক বিশ্বপতি মুখার্জী মেমোরিয়াল লেকচার" দিয়েছেন ডাঃ অতনু পাল। তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল "Where Ayurveda Meets Allopathy?" আয়ুর্বেদের নানান ভাগগুলির সঙ্গে এলোপ্যাথির নানান ভাগগুলিকে নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন।

কোর্সটি সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাতে নতুন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কোর্সটির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন ইসনার কোর্স কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী প্রশান্ত কুমার বসু এবং সম্পাদক, অধ্যাপক মানস চক্রবর্তী। নতুন শিক্ষার্থীদেরকে মঞ্চে ডেকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁদের হাতে কোর্সে পড়াশোনার কাগজপত্র তুলে দেন মিশনের মহারাজ।

১৯৩৫ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও মেঘনাথ সাহার হাত ধরে প্রতিষ্ঠা হয় ইন্ডিয়ান সাইন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের। সেই সময় থেকেই Science and Culture নামে জার্নালটি অবিচ্ছিন্নভাবে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই জার্নালে যে সমগ্র ভারতবর্ষের বহু প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে তা বলেছেন মানস চক্রবর্তী। ষোলই জুন থেকে কোর্সটি শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে দুটি মাধ্যমেই (অফলাইন ও অনলাইন) হবে বলে জানানো হয়েছে। শুধু বক্তৃতা নয়, শিক্ষার্থীদের নানান প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করানো হবে বলেও জানানো হয়েছে। বিজ্ঞানকে গণমুখী করে তোলার এই কর্মকাণ্ডে যে শুধু বিজ্ঞান নিয়ে পড়া পড়ুয়ারাই অংশ নিতে পারবেন, এমন মত মানতে রাজি নন এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ। তাঁদের পক্ষ থেকে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার পাশাপাশি বিজ্ঞান মনস্ক হওয়াটা জরুরী। এর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সবকিছুকে বিচার করার কথা বলা হয়েছে। এই কাজ শুধু বিজ্ঞানের পড়ুয়াদের কাজ নয়, তা আমাদের সবার, বলে বিভিন্ন বক্তা জানিয়েছেন।

ছাত্র, ৩৬তম সায়েন্স কমিউনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া প্র্যাকটিস কোর্স, ইসনা, কলকাতা
shubhankar1996kundu@gmail.com

সঙ্গীত কি বিজ্ঞান?

অংশুদেব ভট্টাচার্য

শাস্ত্রীয় সংজ্ঞায় সঙ্গীতকে গীত, বাদ্য এবং নৃত্য এই তিনটির সমাহার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে "গীত"কেই অধুনা সঙ্গীত রূপে ধরা হয়। সঙ্গীত মূলতঃ স্বর ও ধ্বনির সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি কলা বিশেষ। এর প্রধান চালিকাশক্তি হলো সুর। এই সঙ্গীত মানুষের মনে বহুতর আবেশ সৃষ্টি করে। সে কণ্ঠ নিঃসৃত বা যন্ত্র নিঃসৃত যাই হোকনা কেন। অতএব সঙ্গীত এক প্রকার শ্রবণযোগ্য কলা। ধ্বনি তার নির্দিষ্ট কম্পন মাত্রায় সুসংহত রূপে মানুষের কানে প্রবেশ করে দেহে মনে একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে। এই অবস্থা কখনো আনন্দের, কখনো বিষাদের, কখনো বা উন্মাদনার। কবিতায় যেমন নিপুণ ভাবে শব্দ চয়ন করে মনের বিশেষ ভাব প্রকাশ করা হয়, তেমনই সঙ্গীতে নিপুণতর রূপে সুরের সাহায্য নিয়ে মনোভাব প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সঙ্গীতচিন্তা"য় বলেছেন, "সঙ্গীত আর কিছু নয়, সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা"। সুতরাং, সঙ্গীত মনোভাব প্রকাশের অন্যতম উপায় মাত্র।

অবশ্য, মানুষের জীবন ধারণের জন্য কলা বা শিল্প (art) - এর অনিবার্য প্রয়োজন কিছু নেই। অন্তরের শূন্যতায় প্রকৃতির পূর্ণতা মিশিয়ে মানুষ কলা সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক কারণেই একে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, সঙ্গীতকে 'বিজ্ঞান' অভিধা দেওয়া যায় কি না। বিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিনির্ভর এবং কার্য-কারণ সংজ্ঞায়িত। নিখুঁত ব্যাখ্যায় জারিত এর সিদ্ধান্ত গুলি। এই প্রকার সুনির্দিষ্ট পথে সঙ্গীতকে বিজ্ঞান বলে মানতে পণ্ডিতরা রাজী হবেন না।

কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, সঙ্গীতকে যদি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সেক্ষেত্রে তা আমাদের মস্তিষ্কে কার্য রূপে প্রতিভাত হয়। যদিও ব্যক্তিভেদে তা আপেক্ষিক। অর্থাৎ একই সঙ্গীত এক ব্যক্তির আনন্দ উৎপাদন করে, আবার ব্যক্তিভেদে তা হয়ত বিরক্তি উৎপাদক। এই বোধান্তরের জন্য সঙ্গীত দায়ী নয়, দায়ী শ্রোতার মানসিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে অধিকাংশ মানুষের উপলব্ধির প্রেক্ষিতে। তাই, সঙ্গীতকে বস্তু বিজ্ঞান না বলে কলা-বিজ্ঞান বলা যেতেই পারে। যেহেতু আমরা বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির অন্তিম প্রয়োগকে "কলা" রূপে স্বীকৃতি দিই, সেভাবে যে কলা ধ্বনিতরঙ্গের মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্কে একটি বিশেষ উপলব্ধি সৃষ্টি করছে তাকে "বিজ্ঞান" নামে অভিহিত করলে খুব একটা অন্যায় হবে বলে মনে হয় না।

প্রবীণ সঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষক

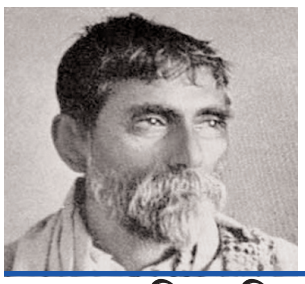

বিজ্ঞান কহন

কলকাতা/জুলাই ১২, ২০২৩, বুধবার, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

>> ২ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

প্রাপ্ত আউটপুট এর মধ্যে পার্থক্য যাতে যথাসম্ভব কম হয় প্রতিনিয়ত সেই চেষ্টাই করে যায় মেশিন লার্নিং এলগরিদম। আর কেবলমাত্র এই প্রশিক্ষণের শেষেই ওই এলগারিদম কে কোন বাস্তব সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করা সম্ভব। আর নির্দিষ্ট কোন কাজকে বাস্তবায়িত করার এই পদ্ধতিটিই হল ডিপ লার্নিং। ঠিক যেভাবে আমাদের মস্তিষ্ক কোন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমে তার পথ খুঁজে বের করে এবং তারপর সেই পদ্ধতিকে বাস্তবায়িত করে লক্ষ্যে পৌঁছায়। আর এই কাজে তাকে সাহায্য করে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে থাকার কোটি কোটি নিউরন। একইভাবে ডিপ লার্নিং এর সহায়ক হল নিউরাল নেটওয়ার্ক।

নিউরাল নেটওয়ার্ক পুরোপুরিভাবে মানুষের মস্তিষ্কের কাজের পদ্ধতিকে অনুসরণ করে। এটি জালের মত ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নোড বা নিউরনের সাহায্যে বিভিন্ন রকমের জটিল তথ্য যেমন কোনো অডিও, ভিডিও, কোনো লেখা বা ছবিকে সহজেই বিশ্লেষণ করতে পারে। এর প্রথম কাজ এই তথ্য গুলোর মধ্যে থেকে একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন খুঁজে বের করা। এবং তার সাহায্যে কাঙ্খিত আউটপুট আর প্রাপ্ত আউটপুট এর মধ্যে সামঞ্জস্য বা পার্থক্য নির্ণয় করা। এই পার্থক্যই হল ওই নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের ত্রুটি বা এরর। প্রত্যেকটি নিউরাল নেটওয়ার্কেরই সবসময় এর চেষ্টা থাকে অ্যালগরিদম তৈরি করার এবং সময়ের সাথে সাথে সেই অ্যালগোরিদম কে উন্নততর করে এই ত্রুটির মান যথাসম্ভব কম করা। এইভাবে অও অ্যালগরিদম একাধিক ইনপুট ও আউটপুট এর মধ্যে একটা ওজন যুক্ত সম্পর্ক (weighted association) তৈরি করে তাকে বিভিন্নভাবে এডজাস্ট করতে থাকে যাতে প্রাপ্ত আউটপুট আরও বেশি করে কাঙ্খিত আউটপুটের কাছাকাছি পৌঁছায়। এরকম অসংখ্য এডজাস্টমেন্ট এর পর প্রদত্ত সমস্যাটির চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনে ট্রেনিং মডিউলটি শেষ করা যেতে পারে। ডিপ লার্নিং এর এই পদ্ধতিটি হল সুপারভাইজড লার্নিং। আমরা অনেকেই গুগল কিবোর্ড এর ভয়েস টাইপিং এর সাথে পরিচিত। দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে করতে কোন একটি নির্দিষ্ট ডিভাইসের ভয়েস টাইপিং আরও উন্নততর হয়। এটা এক ধরনের সুপারভাইজড লার্নিং যেখানে ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক একাউস্টিক লার্নিং নামক অটোমেটিক স্পিচ রিকগনেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিপ লার্নিং এর ট্রেনিং পদ্ধতি আনসুপারভাইজডও হতে পারে। যেখানে ইনপুটের তথ্য ভান্ডার কে কয়েকটা ভাগে আলাদা আলাদা ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। তারপর তাকে কাঙ্ক্ষিত আউটপুটের সাথে মিলিয়ে বিভিন্ন ক্লাস্টারে ভাগ করে ডিপ লার্নিং এলগরিদম।

ধরা যাক কোন একটি কোম্পানির কাছে তার গ্রাহকদের সম্পর্কে বিপুল তথ্য ভান্ডার রয়েছে। যেমন তাদের বয়স, তাদের উপার্জন, তাদের পছন্দ ইত্যাদি। যদি এই তথ্যগুলোকে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন ক্লাস্টার এ সাজানো যায় তাহলে কোন ক্ষেত্রে গ্রাহকদের চাহিদা কিরকম সেটা সহজেই বোঝা যাবে এবং সেই মতো কোম্পানি তার ব্যবসায়িক কৌশল ঠিক করতে পারবে। আর ঠিক এই কাজটাই করে আনসুপারভাইজড লার্নিং পদ্ধতি। দাবা পৃথিবীর অন্যতম জনপ্রিয় বুদ্ধির খেলা। কিন্তু একটা মগজহীন কম্পিউটার সেটা খেলে কি করে? এক্ষেত্রে কম্পিউটারে আরোপিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বারংবার নিজেকেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে। নিজের বিরুদ্ধেই খেলা অভ্যাস করার সময় জেতার জন্য পুরস্কার আর হারলে বরাদ্দ তিরস্কার। ফলে কোন মানব প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে খেলার সময় সে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সহজেই বুঝতে পারে কোন পদক্ষেপগুলো তাকে জয়ের দিকে নিয়ে যাবে আর সেই মতো সে তার নিজের কৌশল কে ক্রমশ আরও শক্তিশালী করে। এটি ডিপ লার্নিং এর আরও একটা পদ্ধতি যাকে বলা হয় রি-ইনফোর্সমেন্ট লার্নিং (re enforcement learning)।

আর এই সমস্ত কাজ করার জন্য কোন নিউরাল নেটওয়ার্কে মূলত তিনটে ভাগ থাকে। ইনপুট লেয়ার যা তথ্য সংগ্রহ করে, আউটপুট লেয়ার যা সেই তথ্যের বিশ্লেষণকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেয় আর এই দুইয়ের মাঝখানে থাকে একটা হিডেন লেয়ার, যেখানে মূলত সমস্ত হিসেব-নিকেশের কাজ হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে ডিপ লার্নিং হল মেশিন লার্নিং এর সাবসেট। আর মেশিন লার্নিং হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাবসেট। (প্রথম পর্ব)

কেমন এই নির্ভরশীলতা?

হ আমাদের স্মার্টফোন কীবোর্ডের স্পিচ টু টেক্সট ফিচারের সাথে আমরা সবাই মোটামুটি পরিচিত। এটা যে আমাদের প্রতি মুহূর্তের কাজকে সহজ করে দিচ্ছে

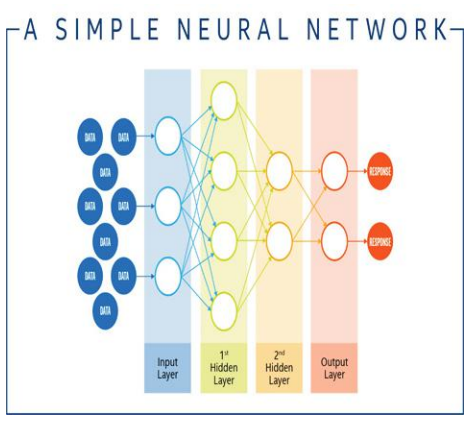

শুধু তাই নয়, শ্রবণ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের স্বাবলম্বীভাবে চারপাশের মানুষজনের সাথে যোগাযোগ করতেও সাহায্য করছে। ট্যাকোট্রন, ওয়েভ নেট, ডিপ ভয়েস এর মত মডেল গুলো খুব সফলভাবেই কোন বাক্য বা শব্দবন্ধকে চিনতে পারা, নতুন বাক্য তৈরি করার কাজ করে আসছে।

এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা চালিত ভার্চুয়াল কেয়ার টুল যেমন চ্যাট বট, ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যানস ইত্যাদি কোন মানুষের সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে শরীরের কোন অস্বাভাবিকত্ব অনুমান করলে সঙ্গে সঙ্গে সে খবর পৌঁছে দিতে পারে চিকিৎসক বা নিকটবর্তী চিকিৎসক কেন্দ্রে। এমনকি প্রয়োজনে আপৎকালীন ব্যবস্থাও নিতে পারে। যাদের একা থাকতে হয় বিশেষত বয়স্ক মানুষদের জন্য এই ব্যবস্থার সুফল মিলেছে বহু ক্ষেত্রেই।

আমাদের প্রত্যেকের হাতেই এখন মোবাইল ফোন আর মোবাইল ফোন আছে মানেই আমরা জিপিএস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যদিও জিপিএস আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দুটো আলাদা প্রযুক্তি কিন্তু এরা একসাথে হলেই ম্যাজিক। জিপিএস মূলত স্যাটেলাইটের সাহায্যে কোন জায়গার অবস্থান জানান দেয় কিন্তু সিগন্যালের টাইম ডিলে, সিগন্যাল লস ও আরো অন্যান্য কারণে এই অবস্থান জানানোর ক্ষেত্রে সামান্য হলেও ত্রুটি রয়ে যায়। কিন্তু অও এর অ্যালগরিদম ক্রমাগত পরিশ্রম করে এই ত্রুটি কমিয়ে আনতে চেষ্টা করে। ট্রাফিকের সঠিক আপডেট, কোথাও রাস্তা বন্ধ আছে কিনা তার হদিস ও প্রায় নির্ভুলভাবে দিতে পারে। যেমন ধরা যাক what3words প্রযুক্তির কথা। এটি একটি এআই নির্ভর পজিশনিং সিস্টেম যেখানে যে কোন জায়গাকে ৩ দ্ধ ৩ স্কোয়ার মিটারের ছোট ছোট গ্রিডে ভাগ করে নেওয়া হয়। আর প্রত্যেকটি ভাগের স্বতন্ত্র নামকরণ করা হয় মাত্র তিনটি সহজ শব্দ ব্যবহার করে। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে সঠিক ঠিকানা পাওয়া মুশকিল কিংবা কিংবা ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক স্যাটেলাইট সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে না সেখানে এই পদ্ধতি রীতিমতো আশা ব্যঞ্জক।

শুধু ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্যই নয়, এই পদ্ধতি ব্যবহার করে চালকের প্রত্যক্ষ অবদান ছাড়াই গাড়ি চলতে পারে গড়গড়িয়ে। ফলত সারা বিশ্বের অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি ক্রমশ ঝুঁকছে চালক-বিহীন গাড়ি তৈরীর দিকে। গুগলের চালকবিহীন গাড়ি বা টেসলার অটো পাইলট ফিচার এই পথের পথিকৃৎ। এমনকি কলকাতার একটি ছোট্ট স্টার্ট আপ সংস্থা ঋরংযবুবনড়ী মারুতি সেলেরিও গাড়ি কে বানিয়ে ফেলেছে স্টিয়ারিং বিহীন। যদিও বাণিজ্যিকভাবে এর উৎপাদন শুরু হতে আরো বেশ কিছু বাধা পেরোতে হবে।

এগুলো যদিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিশাল সমুদ্র থেকে কয়েক বালতি জল মাত্র। পুরো সমুদ্র মন্থন করতে গেলে পৃথিবীর বৃহত্তম মহাকাব্যকেও নিতান্ত বালখিল্য মনে হবে। সার্বিকভাবে বলা যায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ মানুষের একঘেয়ে জটিল কাজগুলোকে অনেক সহজ করে দিয়েছে, কমিয়েছে ত্রুটির হারও। আজকের প্রজন্ম তাই সহজেই নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি তাহলে মানব সভ্যতার প্রতি এক অশনি সংকেত?

অনেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা কোনো যন্ত্র বিশেষ কিছু কাজকে মানুষের থেকে কম সময়ে অধিক দক্ষতার সাথে করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ এটি খুব অল্প সময়েই বিপুল সংখ্যক তথ্য ভান্ডারের বিশ্লেষণ করতে পারে সুচারু রূপে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের ক্ষেত্রে এটা একটা সময় সাপেক্ষ ও পরিশ্রম সাধ্য কাজ। কিন্তু শুধু তথ্য বিশ্লেষণই মানুষের মস্তিষ্কের একমাত্র কাজ নয়। এর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সৃজনশীলতা, মননশীলতা ও চিন্তা শক্তি, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাত এখনও বাঁধা। ফলে কোন আপৎকালীন পরিস্থিতিতে চেনা ছন্দের পতন ঘটলে সেই মুহূর্তে কি করনীয় সেই সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। সময়ের সাথে সাথে হয়তো সে নিজেকে আরও উন্নততর করবে, মানুষের হাতে হাত রেখে কাজ করবে। কিন্তু মানুষের সামনে মূর্তিমান বিপদ হয়ে এগোনোর পথ আটকাবে তেমন সম্ভাবনা আশু নেই বলেই মনে হয়। কৃত্রিম ও সহজাত এই দুইয়ে মিলেই আমাদের বুদ্ধিমত্তা, আমাদের এগিয়ে চলা।

সায়রী বিশ্বাস
সহ অধ্যাপিকা
ডঃ সুধীর চন্দ্র শূর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এন্ড স্পোর্টস কমপ্লেক্স, দমদম

বিজ্ঞানীর চোখে বিজ্ঞান

প্রশান্ত কুমার বসু

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর অমর রচনা শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা-তে লিখেছিলেন : স্নেহ অতি বিষম বস্তু। একটু পরিবর্তন করে আমরা বলতে পারি এখনও বহু লোকের কাছে "বিজ্ঞান অতি বিষম বস্তু!" সেই বিষম বস্তুকে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সাধারণকে বোঝাতে আসরে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও গবেষক ডঃ সৌমিত্র কুমার চৌধুরী। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে কর্কট রোগ সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যপৃত থাকলেও সাধারণের বোধগম্য বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় ক্লান্ত কখনও হননি। শতাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। পুরস্কারও ঝুলিতে ভরেছেন অনেক। সেই সমস্ত রচনার থেকে বেছে সুগ্রন্থিত করে আমাদের সামনে দুই মলাটে ড. চৌধুরী তুলে ধরেছেন তাঁর সাম্প্রতিকতম সংকলন, সহজ ভাষায় বিজ্ঞান ভাবনা। তাঁর নিজেরই কথায় "প্রতিনিয়ত অবৈজ্ঞানিক মিথ্যা প্রচারের ফলস্বরূপ বিপদ ঘটে চলেছে অবিরাম ঘটনার গভীরে গিয়ে মানুষের সামনে কিছু বিষয় তুলে ধরতেই বর্তমান গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ।

কোন বিষয় না স্থান পায়নি ১৬৬ পাতার এই মণিমানিক্যের অন্দরে? জরা, ব্যধি, মৃত্যু থেকে বিশ্ব উষ্ণায়ন, করোনা থেকে ইবোলা, লকডাউন থেকে লেসার, আজিনোমোটো থেকে খাদ্যে রঙ, এমনকি গাঁজা থেকে মহানন্দা। অর্থাৎ এই রচনা সংকলনের ক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ বিষয়ে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, যদিও উনি নিজেই ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। এবং বিদেশী জার্নালেও গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে শতাধিক।

বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে যাঁরা ব্রতী তাঁদের অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় পরিভাষা। কিভাবে লিখব, কিভাবে সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে সেই চিন্তাটা থাকে সর্বাগ্রে। আমি যা লিখলাম সে যদি পাঠক নাই বুঝল তাহলে আর তথ্যের আদান প্রদান হবে কি করে? ডঃ চৌধুরীও সেই চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়ায় ব্যতিক্রম ঘটাননি। পরিভাষার ক্ষেত্রটি আরও সংকটজনক। বাংলা মাধ্যমে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা হয়তো কেলাসন, উদ্বায়ীকরণ এই সমস্ত শব্দবন্ধের সঙ্গে তাদের পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে পরিচিত। কিন্তু একেবারে সাধারণ পাঠক এই কথাগুলির হয়তো ঠিক অর্থ অনুধাবন করতে পারবেন না। কারণ, প্রায় সব এলাকায়ই বিজ্ঞানের মূল শব্দের ব্যুৎপত্তি লাটিন বা ইংরেজী ভাষা থেকে।

এই সমস্ত অবস্থায় crystallization অথবা volatalization তাদের কাছে অনেক বেশি সহজ-গ্রাহ্য হবে। তবে ভাষা বা পরিভাষা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা নিরন্তর চলতেই থাকে। বিজ্ঞান লেখকদের নিরস্ত করা যায় না। ডঃ চৌধুরী যেমন free radicalsএর শব্দবন্ধ তৈরী করেছেন মুক্তমূলক। বিচারের ভার পাঠকের হাতে।

সাম্প্রতিক কালে সর্বাধিক আলোচ্য বিষয় করোনা অতিমারি যা ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, অসুস্থ করে ফেলেছে আরও কয়েক লক্ষ মানুষকে, এবং যার করাল গ্রাস থেকে হয়তো এখনো আমরা মুক্ত হইনি। ভবিষ্যতে শেষ কথা কি সেকথা সময়ই বলবে।

বিষয়টি এই স্বনামধন্য বিজ্ঞানীরও চোখ এড়ায়নি। সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর ভাইরাস ভ্যাক্সিন অতিমারি নিবন্ধে যা পড়ে পাঠক উপকৃত হবেন। কিন্তু এইখানেই ঘটে গিয়েছে কয়েকটি মুদ্রন প্রমাদ। ডাচ জীবাণু বিজ্ঞানী Antoni bb Anton, কলেরার জীবাণু Vibrio cholera নয় cholerae. এইরকম ছোটখাট কয়েকটি ত্রুটি সত্যেও বইটির মুদ্রন সুন্দর, পারিপাট্য সুন্দর এবং বিন্যাসও সুন্দর। প্রথমেই চোখ কাড়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন সমন্বিত প্রচ্ছদটি। আগামী সংস্করণে ছোটখাট বিচ্যুতিগুলো ঢুকে পড়বেনা তো, এই প্রশ্নই বোধহয় রেখে যায়?

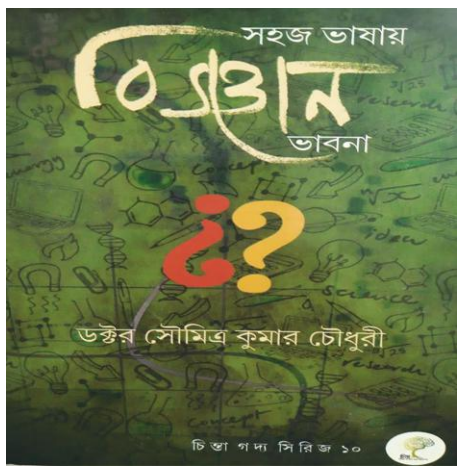

সহজ ভাষায় বিজ্ঞান ভাবনা
ড. সৌমিত্র কুমার চৌধুরী প্রণীত এবং
দেবস্মিতা দাশগুপ্ত এবং উপাসনা দাশগুপ্ত কর্তৃক
চিন্তা থেকে প্রকাশিত, মূল্য ৩০০ টাকা

সম্পাদকীয় সন্দেশ

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আপনাদের আনুকুল্যে আমাদের পত্রিকা "বিজ্ঞান কহন" - এর দ্রুত প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। এমন কি মুদ্রিত সংস্করণগুলিও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এ জন্য আপনাদের অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা একই সঙ্গে নতুন বিভাগেরও সূচনা এবং পরিকল্পনা করেছি। এই সংখ্যা থেকে আমাদের পুস্তক সমালোচনা বিভাগ - বই - জ্ঞান-এর সূত্রপাত হচ্ছে। মূলত বিজ্ঞান ভিত্তিক বইয়েরই প্রাধান্য থাকবে। তবে মাঝে, মাঝে ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে। আপনাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনারা আমাদের কার্যালয়ে বই পাঠান এবং নিজেরাও পুস্তক সমালোচনায় অংশ নিন। আপনাদের সমর্থন পেলে আমরা আগামী দিনে চিঠিপত্র বিভাগ শুরু করব।

নিবন্ধ পাঠানোর ই-মেল

bigyankahon@gmail.com

সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদক: শ্রী প্রশান্ত কুমার বসু
যুগ্ম সম্পাদক: ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক: সুকল্যাণ গাইন

সদস্য: পথিক গুহ, সুধেন্দু মণ্ডল, টি ভি ভেঙ্কটশরণ, মানস চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী, অমিত কৃষ্ণ দে, সুমিত্রা চৌধুরী, বুড়োশিব দাশগুপ্ত, দেবপ্রসন্ন সিংহ, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, মানসপ্রতিম দাস, শঙ্করাশিস মুখোপাধ্যায়, সীমা মুখোপাধ্যায়, মীনাক্ষী দে, আশিস দাস, অর্পিতা চক্রবর্তী, রাতুল দত্ত ও বকুল শ্রীমানী

সম্পাদনা-সহকারী
তুহিন সাজ্জাদ সেখ, সেখ জিন্নাত আলি, অনির্বাণ দে, সৈকত কুমার বসু, শেফালিকা ঘোষ সমাদ্দার, ঝুমুর দত্তগুপ্ত, সায়রী বিশ্বাস

কারিগরি উপদেষ্টা: শিব শঙ্কর দত্ত

৩৬ তম ট্রেনিং পোগ্রাম অন সায়েন্স কমিনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া প্র্যাকটিস,
ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন,
৯২, এ পি সি রোড, কলকাতা ৭০০০০৯ -এর পক্ষে
ড. অমিত কৃষ্ণ দে ও ড. টি ভি ভেঙ্কটশরণ কর্তৃক প্রকাশিত
ই-মেল- isnatraining@gmail.com
website: www.scienceandculture-isna.org

© ISNA: Articles may be reproduced with due acknowledgement to ISNA